দাম : ষোলো টাকা

রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ
বাঙ্গালির হিন্দুত্বের
নবজাগরণের সময়পর্ব
— পৃঃ ২০

স্বস্তিকা

সমাজ সংস্কারক
বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রই ছিল
শস্ত্র— পৃঃ ২৫

৭৭ বর্ষ, ৫ সংখ্যা।। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।। ৬ আশ্বিন, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

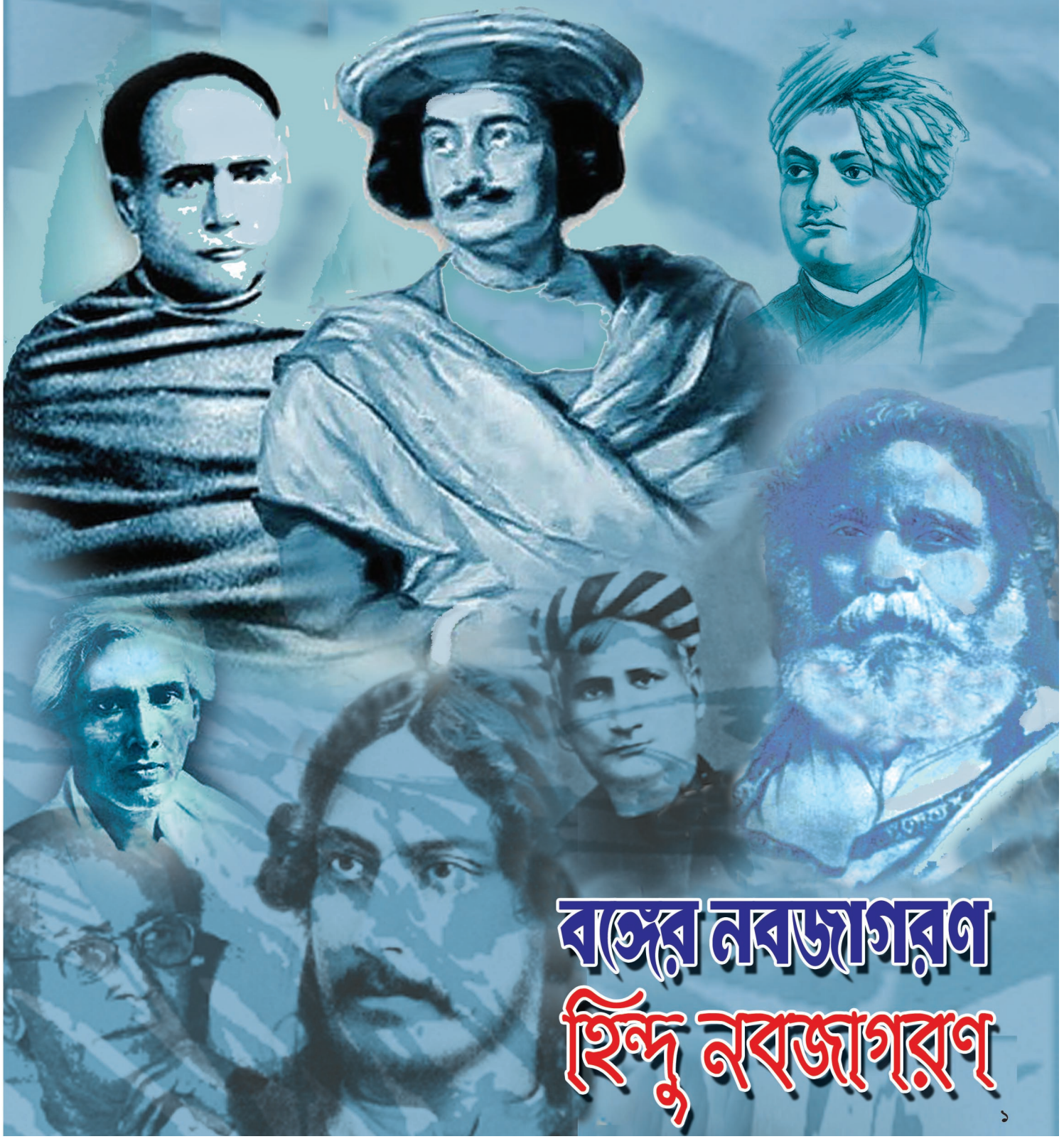

বঙ্গের নবজাগরণ
হিন্দু নবজাগরণ

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ৬ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২৩ সেপ্টেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

উধাও অভিষেক, অভয়ার সুবিচারেই শেষ হবে মমতার অবিচার ছল করে জল... ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

বড্ড দেরি হয়ে গেছে দিদি, বিশ্বাসকে ডাকুন প্লিজ ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

জাতি রক্ষার্থে মাটি ভাগ হয়েছে, এবার ভাষা ভাগ হোক ☐ প্রবীর ভট্টাচার্য্য ☐ ৮

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের দ্বিচারিতায় পূজায় হিন্দুদের ওপর হামলার আশঙ্কা ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

মানুষ আরজি কর কাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত চাইছে ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১১

নাগরিক আন্দোলনের কমিউনিস্ট হাইজ্যাক--- শ্যামাপ্রসাদোত্তর পশ্চিমবঙ্গের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য ☐ দেবযানী ভট্টাচার্য ☐ ১৪

অসমে ইউনিফর্ম সিভিল কোড শীঘ্রই কার্যকর হতে চলেছে ☐ ধর্মানন্দ দেব ☐ ১৭

রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ বাঙ্গালির হিন্দুত্বের নবজাগরণের সমন্বয় পর্ব ☐ অভিমন্যু গুহ ☐ ২০

নবজাগরণের ভোরের পাখি রাজা রামমোহন রায় ☐ রাজদীপ মিশ্র ☐ ২৩

সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রই ছিল শস্ত্র ☐ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ☐ ২৫

বাস্তববাদী বিদ্যাসাগর ☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ৩১

ভাষাশিল্পী বিদ্যাসাগর ☐ দেবায়ন চৌধুরী ☐ ৩৩

রাজা রামমোহন রায়ের জাতীয়তাবাদী মনন ☐ অনীশ দাশ ☐ ৩৫

ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু নবজাগরণের পুরোধাপুরুষরা ☐ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৪৩

দফা এক দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ☐ বিশ্বপ্রিয় দাস ☐ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

☐অঙ্গনা : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ ☐নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে
৩০ সেপ্টেম্বর,
২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৩০ সেপ্টেম্বর,
২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা

থাকছে—

**দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস, জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প, প্রবন্ধ**

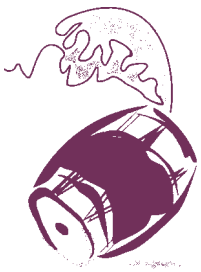

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় নবজাগরণই হিন্দু নবজাগরণ

ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের মাটিতে একদা সোনা ফলিত। সেই সোনার লোভে বৈদেশিক আক্রামণকারীরা বারবার হানা দিয়েছে এই দেশে। বারবার লুণ্ঠন করিয়াও এই দেশকে তাহারা রিক্ত করিতে পারে নাই। হাজার বৎসর ধরিয়া দফায় দফায় তাহারা এই দেশ আক্রমণ করিয়াছে। ভারতের বীর যোদ্ধারা বারংবার তাহাদের বিতাড়িতও করিয়াছে। আক্রমণকারীরা কখনো শক-হুন-কুষাণ, কখনো পাঠান-মুঘল, কখনো ফরাসি-পর্তুগিজ-ওলন্দাজ-ইংরাজ। কিন্তু প্রতিহতকারী শুধুমাত্র ভারতের হিন্দু সমাজ। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ লড়াইয়ে হিন্দু সমাজ ক্লান্ত হইয়া একসময় শুধু আত্মরক্ষার নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি সর্বপ্রকার অরাজকতার কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইসলামি শাসনকালকে অন্ধকার যুগ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। সেই সময় হিন্দুর জীবন-জীবিকা, ধর্ম-সংস্কৃতির উপর নির্বিচারে হামলা চলিয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে, ইসলামি শাসনকালে হিন্দু সমাজে ভয়ানক বিপর্যয় শুরু হইয়াছিল। দীর্ঘ সময় ইসলামি শাসনে হিন্দুর জীবন ও সংস্কৃতি মূর্ছিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুত, এই সময় বঙ্গদেশের উপর নির্মম ইসলামি আক্রমণ প্রবল ঝড়ের ন্যায় বহিয়া যায়। তাহাতেই বঙ্গের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সমস্তই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই বর্বর নির্মম শক্তির আঘাতে বাঙ্গালি সমাজ তাহার চৈতন্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনোপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিতেছিল। ইহার কারণেই সমাজের সর্বস্তরে নানাপ্রকার কুরীতি, কুপ্রথা বঙ্গজীবনকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। ফলস্বরূপ বাঙ্গালির অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার মধ্যেই ইংরাজ শক্তির উদয়। যদিও তাহারা বণিকের ছদ্মবেশে আসিয়া এই দেশ দখল করিয়াছিল, তথাপি বাঙ্গালি সমাজ তাহাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ মনে করিয়াছিল। কেননা ইংরাজ শাসনের কারণে বর্বর ইসলামি শত্রুর কবল হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল। ইংরাজ শাসনে বাঙ্গালি যুব সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভে কূর্মবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইল। শুরু হইল হিন্দু নবজাগরণের কাল।

ঊনবিংশ শতকে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি সমাজে যে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী মানসিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সমগ্র বাঙ্গালি সমাজকে আন্দোলিত করিয়াছিল। তৎকালীন ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রকে ইহা প্রভাবিত করিয়াছিল। তাহার ফলে বঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার ফলেই বঙ্গ সমাজ অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে শুরু করিল। এই নবজাগরণ তথা অগ্রগতি মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। রক্ষণশীল সমাজ এই নবজাগরণকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। নবজাগরণের পুরোধাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়কে বহু লড়াই করিতে হইয়াছে। সতীদাহের ন্যায় কুপ্রথা রদ করিতে তাঁহাকে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত যাইতে হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রের ভিত্তিতেই তিনি সতীদাহ প্রথা রদের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে এবং বাল্যবিবাহের বিপক্ষে যুক্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত নবজাগরণের স্থায়িত্বকালে যাঁহারা পুরোধা রূপে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই হিন্দু সমাজের অগ্রগণ্য বক্তিত্ব। স্বীয় ব্যক্তিত্ব এবং অসামান্য অবদানের মাধ্যমে তাঁহারা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ইসলামি শাসনকালের অরাজকতায় আত্মরক্ষার্থে হিন্দু সমাজকেই কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তাই নিঃসন্দেহে এই নবজাগরণ হিন্দু সমাজের নবজাগরণ। রামমোহন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, রাজনারায়ণ, নবকুমার, ভূদেব, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ স্ব স্ব ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ জাগরণের কার্যই করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও বামমার্গী এবং তথাকথিত সেকুলারবাদীরা এই নবজাগরণকে অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন। কেননা, তাহাতে মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণ ছিল না। ইহা সত্য যে বঙ্গীয় নবজাগরণে মুসলমানদের কোনোরূপ সদর্থক ভূমিকা ছিল না। মুসলমানরা নিজেদের বঙ্গীয় সমাজের অংশ বলিয়া মনেই করে নাই। যদিও তাহারা ধর্মান্তরিত। তাহাদের পূর্বপুরুষ হিন্দুই ছিলেন। আক্রমণকারী পাঠান মুঘলদেরই তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছে । সেই কারণেই মুসলমান সমাজ নবজাগরণের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার যাহা ভালো, তাহা গ্রহণ করিয়াছে এবং নিজেদের বিকশিত করিয়াছে। নবজাগরণের সুযোগ না করিয়া মুসলমান সমাজ মাদ্রাসা শিক্ষায় আবদ্ধ রহিয়াছে। একবিংশ শতাব্দীতেও তাহারা মন ও মস্তিষ্কে মধ্যযুগেই থাকিয়া গিয়াছে। সেই কারণেই দেশের ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদিগকে ভোটব্যাংক হিসাবেই ব্যবহার করিতেছে।

সুভাষিতম্

মৃগাঃ মৃগৈঃ সঙ্গমনুব্রজন্তি গাবশ্চ গোভিঃ তুরগাস্তুরঙ্গৈঃ।
মূর্খাশ্চ মূর্খৈঃ সুধিয়ঃ সুধীভিঃ সমান শীল ব্যসনেষু সখ্যম্।।

হরিণ হরিণদের / গাভী গাভীদের / ঘোড়া ঘোড়াদের / মূর্খ মূর্খদের এবং জ্ঞানীরা জ্ঞানীদের অনুগমন করে থাকে। কেননা, মিত্রতা সমান আচরণ এবং সমান স্বভাবসম্পন্নদের মধ্যেই হয়ে থাকে।

উধাও অভিষেক, অভয়ার সুবিচারেই শেষ হবে মমতার অবিচার

ছল করে জল...

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সব জমানাতেই পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে মমতা জমানায় তা অবিশ্বাস নজিরবিহীন। গত ৮ আগস্ট মধ্যরাতে আরজি কর হাসপাতালে নারকীয় ঘটনার পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখির চোখ (১) ওই ঘটনার বিরুদ্ধে উঠে আসা জনআন্দোলনকে ধ্বংস করা, (২) স্বজনপোষণ। দু'টোই জ্যোতি বসুর আমলের বাম-সংস্কৃতি যার মেধাবী ছাত্রী হলেন মমতা। তা থেকে মমতার সরে আসা অসম্ভব। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। মমতার মতো দুর্বল রাজনীতিকরাই তার পৃষ্ঠপোষক। ভোটের সংখ্যাতত্ত্ব বলে, মমতা পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক আর সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা নন। তবু কেন তার মিথ্যা প্রতাপ। তৃণমূলে নিম্নরুচির কর্মীর পাশে জহর সরকার আর সুখেন্দুশেখর রায়ের মতো ভদ্রলোক রয়েছেন। নিম্নশ্রেণীর দাপটে শিরদাঁড়া হারিয়েছেন অমিত মিত্ররা। জায়গা নিয়েছে শশী পাঁজা ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের মতো তোতাপাখিরা।

মমতার খাঁচাই তাদের ওড়বার স্থান। মমতার কাছে সমালোচনা অসহ্য বস্তু। ৮ আগস্টের পর সেই সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে। কারণ? হারিয়ে ফেলা মেরুদণ্ডটা বাঙ্গালি পুনরুদ্ধার করেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে কন্যা অভয়া বাঙ্গালির মেরুদণ্ডটা ফিরিয়ে দিয়েছে। তার প্রাণের বিনিময়ে তা হয়েছে। তার আত্মা বহ্নিমান থাকবে। সে বীরগতিপ্রাপ্ত। কিন্তু তাঁর মৃত্যু প্রমাণ করেছে যে সে মরেনি। তাঁর মৃত্যুর পরে রাজ্য প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকা দুর্নীতির পর্দাফাঁস চলছে তো চলছেই। বহুদিন থেকেই এ রাজ্যে শয়তানের আত্মারা আনাগোনা করছে। সময়ের সঙ্গে দুরাত্মাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে। হঠাৎ করে উধাও হয়ে গিয়েছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠেকায় না পড়লে সবজান্তা নেতারা অন্তর্ধান করেন না। কিছু দিন আগেই কয়লা পাচার কাণ্ডে অভিষেকবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর রক্ষাকবচ সরিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে সমন পাঠিয়ে তাকে আটক করা হতে পারে। তিনি ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছেন। ফেঁসেছেন অভিষেক, তবে ডুবেছেন মমতা। কন্যা অভয়ার সুবিচার মানেই মমতার অবিচারের দিন শেষ। তাই ছল করে জল মাপতে মমতা আন্দোলনকারীদের ধরনা মঞ্চে গিয়েছিলেন।

ছলনা করেই মমতা রাজনীতিতে টিকে থাকেন। ফাঁসি বিল তার আর একটি প্রমাণ। চালাকি করে তিনি সব প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে পারেন। যদিও এর কোনো প্রমাণ নেই। অভয়া মামলায় ঘুরিয়ে নাক দেখাতে সুপ্রিম আদালতে ২১ জন উকিলকে লাগিয়েছেন তিনি। এখন গোদের ওপর বিষফোঁড়া অভিষেক। শ্যাম রাখি না কুল তা নিয়ে দিশেহারা মমতা। কিছু স্তাবক, ঘাড় ভাঙা আমলা আর মধ্যস্থতাকারী অকর্মণ্য সাংবাদিকের বুদ্ধি ধার করে রাজ্য চালান বলে শুনেছি। অন্ধরা অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে। তার বিরোধিতার নাম করে কিছু ইউটিউবার বেলাইনে তাকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে।

অভয়ার সুবিচার দিয়েই শুরু হবে মমতার অবিচারের শেষ। মমতা বনাম অভয়ার লড়াইয়ে জিতবে সুবিচার আর অভয়া। তাতে আগুন ঝরানো অভয়ার বহ্নিমান আত্মা শান্তি পাবে।

তথ্যহীন, প্রমাণরহিত আর অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা করে মমতার মিথ্যা গ্যাসবেলুনকে ফুলিয়ে দিচ্ছে। প্রকাশ্যে দাবি করলেও কন্যা অভয়া যাতে সুবিচার না পায় সে দিকেই নজর মমতার।

তাই উৎসব করুন, ক্ষমা করুন বলে চেয়ার ছাড়ার নাটুকে কথাবার্তা বলছেন। ইউটিউবারদের মনের মাধুরী মেশানো অবান্তর রাজনৈতিক বাখ্যায় সুযোগ নিচ্ছেন যাতে অভয়ার সুবিচার গুলিয়ে যায়। মমতার ছলনার শেষ নিদর্শন আন্দোলনরত চিকিৎসকদের কাছে দিদি সেজে ধরনা মঞ্চে যাওয়া। ভাবটা দিদিকে বলো আর দিদির কথা শোনো। বয়স আর অভিজ্ঞতা অল্প হলেও আন্দোলনকারীরা নিশ্চিত তাদের বাপ ঠাকুরদার কাছে মমতার নাটুকেপনার গল্প শুনেছেন। তাই আগে থেকেই সাবধান ছিলেন।

বাপ দাদার কথা যে সত্য তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চালাচ্ছেন মমতা আর বাড়িতে চা খাওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছেন। বাড়ির আলোচনায় জনদাবির নিষ্পত্তি চাইছেন। আন্দোলনকারীরা মমতার রাজনৈতিক ফাঁদে পা দেননি। জনমানসে মমতার বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে। অভয়ার বিচার চাপা দিতে মমতার দলবল আসামিদের মতো কাজ করেছে বলে প্রমাণ হচ্ছে সিবিআই তদন্তে। অভয়ার সুবিচারের জন্য যে জনআন্দোলন শুরু হয়েছে মমতা ছল করে তাতে জল ঢালাতে চাইছেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অভয়ার সুবিচার দিয়েই শুরু হবে মমতার অবিচারের শেষ। মমতা বনাম অভয়ার লড়াইয়ে জিতবে সুবিচার আর অভয়া। তাতে আগুন ঝরানো অভয়ার বহ্নিমান আত্মা শান্তি পাবে। বেঁচে থাকবে সবার মধ্যে। সর্বকালের জন্য। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

বড্ড দেরি হয়ে গেছে দিদি, বিশ্বাসকে ডাকুন প্লিজ

অবিশ্বাসেষু দিদি,

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে। আমি সবার আগে সেটা বলতে চাই। A mistake is an accident. Cheating and lying are not mistakes. They are intentional choices. বাচ্চারা অনেক সময়ে ভুল কিছু করলে আমরা বলি, ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু বারবার যদি কেউ একই ভুল করে যায় আর তিনি যদি প্রবীণ হন, তবে সেটা আর ভুল নয়, সেটা অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতা। কেউ যদি বারবার মিথ্যা কথা বলেন, মানুষকে ঠকান তবে সেটা ইচ্ছাকৃত। তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ রয়েছে।

দিদি সবাই বলছে যে, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এখন সেই দশা। তিনি যখন স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জুনিয়র চিকিৎসকদের ধরনায় গেলেন তখন অনেকেই ভয় পাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল মুখ্যমন্ত্রী এক্ষুনি পড়ে যাবেন। পা ভেঙে যাবে। তার পরে প্লাস্টার করে তিনি সহানুভূতি কুড়োবেন। কিন্তু ঈশ্বরের অশেষ কৃপা যে তাঁর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু চিন্তা হচ্ছিল এটা ভেবে যে, সন্দীপ ঘোষ তো সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার। পায়ে মিছি মিছি প্লাস্টার কে করে দেবে? আমি ভাবিনি দিদি। সবাই ভাবছিল।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, আমাদের এটা লজ্জার যে, দেশের কেউ আপনাকে বিশ্বাস করে না। কোনো রাজনৈতিক দল নয়। আপনি যে ইন্ডি জোটে রয়েছেন তার কোনও দল আপনাকে বা আপনার দলকে বিশ্বাস করে না। কারণ, কখন আপনি কী বলবেন তার ঠিক নেই। আপনার দলের নেতারা কি আপনাকে বিশ্বাস করেন? না। সবাই তো চুপ করে রেয়েছেন। কেউ কেউ ফোঁস করেছেন। এক সাংসদ ইস্তফাও দিয়ে দিয়েছেন। আর একজন যাব যাব করছেন। কারণ, তৃণমূল নামে দলটায় আর যাই থাকুক বা না থাকুক বিশ্বাস নামে শব্দটাই নেই। ফিরিয়ে আনুন দিদি।

আরজি কর কাণ্ডে আপনি প্রথম থেকে মিথ্যা কথা বলে এসেছেন। নিজে তো মিথ্যা বলেছেনই, সেই সঙ্গে নির্যাতিতার বাবা-মাকে মিথ্যাবাদী সাজাতে পথে নেমেছেন। ধর্ষণ ও খুনকে চাপা দিতে একটা মিথ্যার কুহেলিকা তৈরি করে পুলিশ। সন্দীপ ঘোষ, বিনীত গোয়েল, টালা থানার ওসি ছাড়াও অনেকে রয়েছেন এর পিছনে। কিন্তু সবাই বলছে, আপনি না বললে কেউ কিছুই করতে পারত না। আপনার নির্দেশেই নাকি ডিসি নর্থ টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন। ডিসি সেন্ট্রাল দিনের পর দিন সাংবাদিক বৈঠক করে মিথ্যা তথ্য প্রচার করেছেন। আর আপনি নিজেই বলেছেন, ক্ষতিপূরণের জন্য ১০ লক্ষ টাকা তিনি নিতে চেয়েছিলেন আবার নিজেই বলছেন সেটা তিনি বলেননি। এটা করে সদ্য নিদারুণ কষ্ট পেয়ে যাঁদের কন্যা চলে গিয়েছেন সেই বাবা-মাকে মিথ্যাবাদী সাজাচ্ছেন। এটা ঠিক নয় দিদি।

সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে, নিরাপত্তার জন্য টাকা বরাদ্দ করেছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়েছে কি? সুপ্রিম কোর্টে আপনার অনেক মামলাই আটকে রয়েছে। সর্বত্র প্রশ্ন রয়েছে আপনার বিশ্বাস নিয়ে। মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আপনি বারবার মিথ্যা কথা বলেছেন। আপনি শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মিথ্যা বলেছেন। আপনার দল সন্দেশখালি নিয়ে মিথ্যা বলেছে। আর সবই হয়েছে আপনার নির্দেশে। আমি আজ বলে রাখছি, কান খুলে শুনে রাখুন, আরজি কর কাণ্ড দিয়ে শুরুটা হলো। এর পরে একটার পর একটা ঘটনায় আপনার মিথ্যা মানুষের সামনে নিয়ে আসার কাজটা করবে মানুষই। আপনি কেন্দ্রের বরাদ্দের টাকা অন্য খাতে খরচ করে, পার্টি ফান্ডে দিয়ে যে মিথ্যা হিসেব জমা দিয়েছেন তা আজ কেন্দ্রীয় সরকার ধরে ফেলেছে। সাধারণ মানুষই সেই মিথ্যার ঝুলি ফাঁস করার দায়িত্ব নেবে। তাই এখন থেকেই বলে রাখছি আপনি সাবধানে থাকুন।

আপনি চাইছেন রাজ্যের মানুষ উৎসবে মেতে উঠলে, টানা চলতে থাকা জনগণের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবে। তাই তো আপনি এবার শুনলাম বড়ো করে পূজার কার্নিভাল করার কথা ভাবছেন।

আপনি বারবার বলছেন আপনার মন খুবই ভারাক্রান্ত। নির্যাতিতার বিচার চাইছেন আপনিও। কিন্তু সেটা যে কত বড়ো মিথ্যা কথা সেটা আপনার মুখ থেকেই বেরিয়েছে। আপনি রাজ্যবাসীকে বিশেষ করে আন্দোলনকারীদের পূজায় ফিরতে, উৎসবে ফিরতে বলেছেন। আপনি গত ১২ সেপ্টেম্বর নবান্নে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকের সরাসরি সম্প্রচারে বলেন, 'এক মাস তো হয়ে গেল। আমি অনুরোধ করব, পূজায় ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন।' আপনি চাইছেন রাজ্যের মানুষ উৎসবে মেতে উঠলে, টানা চলতে থাকা জনগণের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবে। তাই তো আপনি এবার শুনলাম বড়ো করে পূজার কার্নিভাল করার কথা ভাবছেন। কিন্তু সেটাও ঠিকঠাক করা যাবে কি না আমার সন্দেহ রয়েছে। তাই বলছি, ভেবে চিন্তে পা ফেলুন দিদি। □

জাতি রক্ষার্থে মাটি ভাগ হয়েছে এবার ভাষা ভাগ হোক

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

কলকাতাকে না পাওয়ার বেদনা পূর্ব পাকিস্তানিদের কীভাবে কুরে কুরে খেয়েছে তা দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর ধরে পাক বুদ্ধিজীবীরা তাদের সাহিত্যে, আলোচনায় বারবার তুলে ধরেছে। বাংলাদেশ গঠনের মূলে যেমন পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রধান কারণ ছিল অর্থনীতি, তেমনই আরও একটি প্রধান কারণ হলো বাঙ্গালি জাতিসত্তাকে চুরি করে নেওয়া। বাংলাদেশের নামের আড়ালে এই কাজটাই তারা এতদিন ধরে করে এসেছে। ধীরে ধীরে প্রকৃত বাঙ্গালির ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি— সব কিছুর এরা পরিবর্তন করে দিয়েছে অত্যন্ত কৌশলে। সহজ সরল বাঙ্গালি তা বুঝতেও পারেনি। বাংলা ভাষায় কথা বলা নেই যে বাঙ্গালি হওয়া যায় না, এই সহজ সত্যটা কাউকে বোঝানোই যাচ্ছিল না। ভারতের বাইরে এখনো বেশিরভাগ মানুষ ভাবে বাংলাদেশিরাই বোধহয় প্রকৃত বাঙ্গালি।

এর ফলে ২০১৭-য় নিউইয়র্কে, টামি স্কোয়ারে আত্মঘাতী মানববোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর চেষ্টা করে এক বাংলাদেশি জেহাদি আকায়েদ উল্লাহ, ২০১০-এ লন্ডনে ব্রিটিশ সাংসদ স্টিফেন টিমসকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে রোশনারা চৌধুরী নামে এক জেহাদি তরুণী বা কোভিড মহামারীর দ্বিতীয় দফার লকডাউন শুরু হওয়ার ঠিক চার ঘণ্টা আগে প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল ভিয়েনা-— এই সন্ত্রাসবাদী কাণ্ডে পুলিশ যে ১৫ জন সম্ভাব্য জেহাদিকে গ্রেপ্তার করেছিল তাদের মধ্যে দু'জন বাংলাভাষী। এরা সকলেই বাংলায় কথা বলে, তাই গোটা পৃথিবীর মানুষ জেনেছে এই সকল জঙ্গি বাঙ্গালি। গত কয়েক দশক ধরে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা পাখি পড়ার মতো আমাদের গিলিয়ে এসেছে, বাংলায় কথা বললেই বাঙ্গালি। নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানে জাতিসত্তার স্বীকৃত সংজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, ধর্ম ও সংস্কৃতি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে জাতিসত্তার এই উত্তর-আধুনিক সংজ্ঞাই চলছে আজকাল। তাই ভিয়েনার সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদী আকায়েদ উল্লাহ ও রোশনারা চৌধুরী সকলেই বাঙ্গালি হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বও এখন বাঙ্গালিকে এভাবেই চিনতে শিখছে। নুর দাড়ি আর হিজাব তার পরিচয়। বাঙ্গালির জাতিসত্তা দখল হয়ে গেছে, এবারে বাংলা ভাষার পালা।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি হিন্দু বাঙ্গালি এবং তার ভাষার সর্বনাশ শুরু হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশ পত্তনের মধ্য দিয়ে। যে শব্দবন্ধ দেশভাগের আগে অখণ্ড বঙ্গদেশকে বোঝাত, দেশভাগের পরে সনাতনী বঙ্গভাষীর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের বোঝাত, ১৯৭১ সালের পর তা স্বাধীনতাকামী পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নাম হয়ে গেল। বাঙ্গালিকে লেবেনচুস খাইয়ে অত্যন্ত কৌশলে ও ধূর্ততায় বিশ্বের সমস্ত অপকর্মের দায় হিন্দুদের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে এরা নকল বাঙ্গালি সেজে ফুর্তি করছে।

দোল, দুর্গাপূজা, তুলসীমঞ্চ, নাটমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপের বাঙ্গালি এখন ব্যতিব্যস্ত আজানের উৎপাতে। মহারাজা শশাঙ্ক প্রবর্তিত কালপঞ্জিকা বঙ্গাব্দের রূপকারের নাম শুনতে হচ্ছে মোগল বাদশা আকবর। প্রায় দেড় হাজার বছর আগের এই ইতিহাসে মাত্র সাড়ে পাঁচশো বছরের পুরাতন শাসকের নাম কীভাবে ঢুকে যায় সে প্রশ্ন কেউ তোলে না, এটাই আশ্চর্যের! লাহোরে পাকিস্তানের গণপরিষদের বৈঠকে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হোক, এই দাবির মূল হোতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমহরি বর্মন, শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তারা আজ কোথায়? নকল কতগুলি মানুষের নাম বসিয়ে দিনের পর দিন একুশে ফেব্রুয়ারিতে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। মানভূম, অসমের বরাকভূমি, দাড়িভিটের ভাষা আন্দোলনের অভিঘাত, ভাষার প্রতি তীব্র আবেগে এতগুলি মানুষের বলিদানের ইতিহাস মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা স্বীকারই করা হয়নি। কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, জয়দেব, শ্রীচৈতন্য, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের বঙ্গে বাঙ্গালিকে শুনতে হয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি মুজিবুর রহমান! বাংলা ক্যালেন্ডারের দফারফা করে কিছু ভুঁইফোঁড় বাঙ্গালি প্রকৃত বাঙ্গালির আলপনার সৌন্দর্যকে পদদলিত করে পয়লা বৈশাখে রাজপথে বিশাল বিশাল আলপনা এঁকে দেয়।

তারপর দিনভর সেই আলপনার উপর দিয়ে চলে গাড়ি, ঘোড়া, মানুষ, কুকুর। অথচ আলপনা একটি হিন্দু বাঙ্গালি ঐতিহ্য। আলপনার অবস্থান দেবতার বা দেবতার আসনের ঠিক মাঝখানে। আলপনা সাধারণ কোনো চিত্রকলা নয়, এটি একটি পবিত্র চিত্রকলা। উত্তর ভারতে একই ধরনের চিত্রকলা 'রঙ্গোলি', দক্ষিণ ভারতে কোথাও 'পুকালাম' কোথাও 'মণ্ডলা' নামে পরিচিত। ওইসব অঞ্চলের মানুষেরা কেউ কল্পনাও করতে পারেন না, রঙ্গোলি বা পুকালামের উপর পা রাখার কথা। অথচ বাঙ্গালির আদি সংস্কৃতি বাংলাদেশের দখলে যাবার পর এমনই হতশ্রী অবস্থা হয়েছে

আলপনার। এখন তো এই ঐতিহ্য দলিত হয়ে পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তায় রাস্তায় দেখা যাচ্ছে।

শাস্ত্রে বলেছে, 'বাণিজ্যে বসতঃ লক্ষ্মী।' কিন্তু বাঙ্গালির হাতে বাণিজ্য কই? সে সবও ক্রমশ লুঠ হয়ে যাচ্ছে। একদিন চাঁদ সওদাগরেরা এই বঙ্গের মসলিন, রেশমের কাপড় নিয়ে যেতেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে। 'ঢাকাই মসলিন' নামেই এই কাপড় বহু যুগ ধরেই বিশ্ববিখ্যাত। মসলিন কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'মসৃণ' থেকে। মসলিন কথাটি যে সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, এর থেকেই বোঝা যায় যে এটি হিন্দু বাঙ্গালি তাঁতিদের সৃষ্টি। কথিত আছে যে এই কাপড় এতই সূক্ষ্ম ছিল যে আঠারো হাত কাপড় একটা আংটির মধ্য দিয়ে গলে যেত। সনাতন বাঙ্গালির মেধা ও শ্রমের মেলবন্ধনে সৃষ্ট যে অপূর্ব শিল্পকর্মকে এককালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ধ্বংস করে দিয়েছিল, দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটেমাটি উচ্ছেদ হয়ে পালিয়ে আসা হিন্দু বাঙ্গালির মেধা ও শ্রম তা পুনরায় সৃষ্টি করেছে পশ্চিমবঙ্গের কালনায়। অথচ 'ঢাকাই মসলিন' কথাটার জোরেই হয়তো এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি জিআই পেয়ে যাবে বাংলাদেশ। যেভাবে ২০১৭ সালে জামদানির জিআই পেয়েছে। অথচ জামদানির আদি প্রস্তুতকারী হিন্দু বাঙ্গালি বস্ত্রবয়নশিল্পীরা দেশভাগের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ফুলিয়ায় নির্বাসিত।

হিন্দু বাঙ্গালিকে ওরা চায় না, কিন্তু হিন্দু বাঙ্গালির সৃষ্টি করা শিল্পকলার মালিকানা ওরা দখল করতে চায়। একইভাবে ইসলামি বাংলাদেশ দখল করেছে হিন্দু বাঙ্গালি ময়রাদের সৃষ্টি অপূর্ব সব মিষ্টি। বগুড়ার লাল দই, পোড়াবাড়ি চমচম, মহিষের দুধের দই— এই সবই এখন জিআই প্রাপ্তির সৌজন্যে বাংলাদেশের দখলে আগামীদিনে আরও কত কী বেহাত হবে, কে জানে!

বাঙ্গালির ভাষার ইতিহাস কত বছরের পুরাতন তা অনুমান করা খুবই কষ্টকর। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে চর্যাপদের যে পুঁথিগুলি উদ্ধার করেছেন, আপাতত বাংলা ভাষায় লিখিত এগুলিই সবচেয়ে পুরাতন দলিল হলেও অনুমান করাই যায় তেরশো বছর আগেও কত সমৃদ্ধ ছিল এই ভাষা ও তার সাহিত্য। প্রাকৃত শব্দে সমৃদ্ধ এই বাংলাভাষা সংস্কৃতের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ ভাষা সমাদর পেয়ে এসেছে। সংস্কৃতের পাশাপাশি এই ভাষারও সর্বনাশ ঘটিয়ে চলেছে পদ্মাপারের ওই আরবীয় মদতপুষ্ট হানাদারেরা। অকারণে, অপ্রয়োজনে নিজস্ব শব্দ থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য আরবি শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটিয়ে একটি নকল, কলুষিত বাংলা ভাষার সৃষ্টি করেছে তারা। কায়েম, হক, ইনসাফ, কুর্নিস প্রভৃতি আরবি, ফার্সি, তুর্কি শব্দ এখন বাংলাভাষার পরিচয়। আধুনিক প্রযুক্তি কম্পিউটারে গুগলে, উইকিপিডিয়ায় এসব জগাখিচুড়ি বাংলা ভাষা শিখেই বড়ো হচ্ছে এ প্রজন্মের হিন্দু পড়ুয়ারা।

এই একই কাণ্ড কিন্তু হচ্ছিল গ্রিসের আদি মেসিডোনীয়দের সঙ্গে। যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে সৃষ্টি হওয়া মেসিডোনিয়ার স্লাভ বংশোদ্ভূত নব্য মেসিডোনীয়রা একে একে দখল করছিল তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। তারপর একদিন আলেকজান্ডার হয়ে গেলেন স্লাভ। এতেই টনক নড়ে আদি মেসিডোনীয়দের। গ্রিসের কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় মেসিডোনিয়া অঞ্চলে আদি মেসিডোনীয়রা আন্তর্জাতিক স্তরে দরবার করে এই জাতিসত্তা চুরির বিরুদ্ধে। অবশেষে যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে সৃষ্ট মেসিডোনিয়ার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'উত্তর মেসিডোনিয়া'। নিজেদের আত্মপরিচয় ফিরে পায় গ্রিসের আদি মেসিডোনীয়ারা।

বাঙ্গালিকে বাঁচতে হলে এই রকমই কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। উভয় অঞ্চলের মানুষ বাংলায় কথা বললেও, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, হিন্দু বাঙ্গালির বাংলা ভাষা আর ছদ্ম বাঙ্গালির বাংলা ভাষার মূলগত বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য কোনো অঞ্চলভিত্তিক উপভাষাগত পার্থক্য নয়। সনাতন বাংলা মানে ঘটি ভাষা আর বাংলাদেশি বাংলা মানে বাঙাল ভাষা এমন নয়। ঘটিরাও সনাতন বাঙ্গালি, আবার বাঙ্গালরাও তাই। ঘটি-বাঙ্গাল দুজনের বাংলা ভাষাই আদি সনাতন বাংলা। কিন্তু সনাতন বাংলা আর আরবি বাংলা এক নয়। এই দুই ভাষার পার্থক্য তার চরিত্রে যা গঠিত হয়েছে মধ্যযুগ থেকে এবং পরিশীলিত হয়েছে দেশভাগের পর। বাংলাদেশ গঠনের আগে থেকে, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান আমলেই 'আরবি বাংলা'-কে সুগঠিত করা হয় প্রায় ৩০ শতাংশ আরবি-ফার্সি শব্দ যোগ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হবার পর এই 'আরবি বাংলা'-ই হয়ে ওঠে বাংলাদেশি বাংলা। ভাষা বিবর্তনে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। সার্বিয়ান আর ক্রোয়েশিয়ান ভাষা যেমন। দুটোরই শব্দ, ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রায় এক হলেও, নির্দিষ্ট কিছু মূলগত পার্থক্যের জন্য ভাষা দুটি পৃথক ভাষা হিসেবেই স্বীকৃত।

ভাষা নিয়ামক সংস্থা 'এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল'-এর ভাষা স্ট্যান্ডার্ড আইএসও ৬৩৯-৩ কোডের ব্যাখ্যায়, একক ভাষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— দুটি ভাষা ভাব আদান প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় পারস্পরিকভাবে অনুধাবনযোগ্য হলেও, সুপ্রতিষ্ঠিত পৃথক জাতিগত সত্তার অস্তিত্ব থাকলে এবং বিশেষ করে যদি ওই দুই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক সীমারেখা থাকলে দুটিকে পৃথক ভাষা হিসেবে গণ্য করতে হবে। 'ভাষা নিয়ামক সংস্থা' হলো এমন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যারা পৃথক ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে এবং কোন কোন নিয়ম মানলে তবে একটি ভাষাকে আরেকটির থেকে পৃথক বলা যায়, সেসবেরও নীতি নির্দিষ্ট করে।

ধর্ম-সংস্কৃতির ভিত্তিতে সনাতনী বাঙ্গালি ও ছদ্ম বাঙ্গালির পৃথক জাতিগত সত্তা দেশভাগের সময়ই স্বীকৃত। কারণ সত্যিই যদি উভয়ে এক জাতি হতো, তাহলে বঙ্গভাগের দরকার পড়ত না। তাছাড়াও দেশভাগের পরে এই দুটো জাতিসত্তা পৃথক পৃথকভাবে বিকশিত হয়েছে। যার প্রভাব ব্যবহার্য ভাষাতেও পড়েছে। এই যুক্তিতেই মূক-বধিরদের জন্য ব্যবহৃত সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে ২০১৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ও বাংলাদেশের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ পৃথক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই স্বীকৃতি দিয়েছে উপরোক্ত ভাষা নিয়ামক সংস্থা। উপযুক্তভাবে আবেদন করলে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মতো একইভাবে স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রেও এই পৃথক স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব।

আত্মপরিচয়ের এই সংকট থেকে মুক্ত হতে গেলে হিন্দু বাঙ্গালি নেতৃত্বকে সমস্ত আবেগ সরিয়ে রেখে ভাষা ভাগ করার বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ১৯৪৭-এও অস্তিত্ব সংকট থেকে মুক্ত হতে সনাতন বাঙ্গালি নেতৃত্ব সমস্ত আবেগকে সরিয়ে রেখে মাটি ভাগ করার কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, প্রেমহরি বর্মনের সেই দূরদর্শী সিদ্ধান্তেরই সুফল, বিশে জুন পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি। সেই পথই অনুসরণ করতে হবে আজ। নিজেদের এক টুকরো মাটি পেয়েছি প্রায় সাড়ে সাত দশক আগে, এবারে ভাষার দখল চাই। বাংলাদেশি ভাষা বাংলাদেশেরই থাক, সনাতনী বাংলা পশ্চিমবঙ্গ পাক, এই দাবির পক্ষে আওয়াজ উঠুক। □

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের দ্বিচারিতা
পূজায় হিন্দুদের ওপর হামলার আশঙ্কা

প্রতি বছর আশ্বিন মাসে শারদপ্রাতে যখন পশ্চিমবঙ্গে বেজে ওঠে আনন্দের আলোকমঞ্জির, তখন পূর্ববঙ্গে আলোর রোশনাই নিভে গিয়ে বিষাদের ঘন কালো ছায়া যেন নেমে আসে। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, তাঁদের সম্পত্তিহানি, জীবনহানি, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে দুর্গামূর্তির অসম্মান, বিগত সময় ধরে বাংলাদেশে চলে আসছে। দু'বছর আগে দুর্গাপূজার মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দুবিরোধী হিংসার স্মৃতি এখনো টাটকা। ২০২২ সালে বাংলাদেশে পূজার সময় গুজবের ওপর ভিত্তি করে ব্যাপক হিংসা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভাঙচুর করা হয় একের পর এক দুর্গামণ্ডপ ও মন্দির। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল বহু মণ্ডপে। সেই ঘটনায় মোট ১০ জন হিন্দুর মৃত্যু হয়েছিল। এবার আরও বিশেষ করে সারা বিশ্বের নজরে থাকছে ভারতের পড়শি দেশে। ইউনুস সরকার আসার পরই যেভাবে হিন্দু-নিগ্রহের খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে কতটা শান্তিতে হয় মা দুর্গার আরাধনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে প্রথমে জানানো হয়েছিল যে, রাজনৈতিক ডামাডোল সত্ত্বেও প্রতিবারের মতো এবারও দুর্গাপূজা হবে। এবছর বাংলাদেশে প্রায় ৩২ হাজার পূজা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে পূজা মণ্ডপে হামলা চালানোর মতো যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, তা এড়ানোর জন্য নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা পরিষ্কার নয়।

এরই মধ্যে খবর পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশে দুর্গাপূজা নিয়ে বেশ কিছু ফতোয়া জারি করা হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী। বৈঠক শেষে তিনি জানান, দুর্গামণ্ডপগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মণ্ডপে যাতে হামলা না চলে, তার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হবে, যারা মণ্ডপ পাহারা দেবেন। স্থানীয় বাসিন্দা বা পূজার সঙ্গে যুক্ত যারা, তাদেরই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন শিফটে তাদের এই দায়িত্বভার দেওয়া হবে। তিনি এও জানান, মণ্ডপের নিরাপত্তার জন্য রাতে অন্তত তিনজন এবং দিনে কমপক্ষে দু'জন স্বেচ্ছাসেবককে দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসেবকদের প্রকৃত পরিচয় কী?

এর আগে সেদেশের ধর্মীয় বিষয়ক পরামর্শদাতা খালিদ হোসেন জানিয়েছিলেন, মণ্ডপে যাতে কোনো হামলা বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য স্থানীয় বাসিন্দা ও মাদ্রাসার পড়ুয়ারা মণ্ডপ পাহারা দেবে। আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন যে, ভক্ষকের হাতে রক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়া কি আদৌ যুক্তিযুক্ত হবে? এরই মধ্যে লেখিকা তসলিমা নাসরিনও বাংলাদেশের পূজা নিয়ে পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাঁর বক্তব্য, 'বাংলাদেশ আপাদমস্তক একটি সাম্প্রদায়িক দেশ। মন্দির পাহারা দেবার জন্য মাদ্রাসার ছাত্রদের বসিয়ে একে অসাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে চাওয়া রীতিমতো প্রহসন। হিন্দুদের মন্দিরে, বাড়িঘরে, দোকানপাটে মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রায়ই হামলা করে। ভক্ষককে রক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখলে ইউনুস বাহিনীর গায়ে পুলক লাগতে পারে, হিন্দুদের গায়ে পুলক লাগবে না।'

এখানেই শেষ নয়, তিনি একটি পোস্টও শেয়ার করেন, যেখানে লেখা আছে, 'মাদ্রাসা ছাত্র দিয়ে পূজামণ্ডপ পাহারা বসানো স্থূল ও গ্রাম্য আইডিয়া। গেটের সামনে একদঙ্গল মাদ্রাসা ছাত্র বসা দেখলে পূজায় কেউ যাবে না। পূজাগুলো পূজার মতো সহজ স্বাভাবিক থাকুক। পূজার স্থানগুলো সকলের প্রাণবন্ত পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠুক। বরং যাদের দ্বারা পূজামণ্ডপ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা, মাদ্রাসা ছাত্ররা তাদেরকে পাহারা দিক।'

এরই মধ্যে বাংলাদেশে সরকারের মোল্লাবাদী রূপটি আরও একবার প্রকাশ্যে চলে আসে। তাদের ধর্মীয় সম্প্রীতির মুখোশটি খসে পড়ে সাম্প্রদায়িক নগ্ন মুখটি দেখা যায়। সেদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে মসজিদে আজানের সময় মণ্ডপে ঢাক-ঢোল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজানের ৫ মিনিট আগেই মাইক ও যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজানো বন্ধ করতে হবে। আজান শেষের পরই ফের মাইক বা ঢাক বাজানো যাবে বলে জানানো হয়। এই ফতোয়াকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মাচরণে বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারের এই দ্বিচারী মনোভাবের সুযোগ নিতে দেরি করেনি দুষ্কৃতীরা। তারা বিনা প্ররোচনায় ফরিদপুরে বেশ কিছু নির্মীয়মান দুর্গামূর্তি ধ্বংস করে।

সেখানকার ভাঙা উপজেলার সদর বাজার এলাকায় একটি হরি মন্দিরে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বেশ কিছু প্রতিমা নির্মাণের কাজ চলছিল। হরি মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক তরুণচন্দ্র সাহা বলেন, 'কয়েকদিন আগে মৃৎশিল্পীরা মাটির কাজ শেষ করে গিয়েছেন। বৃষ্টি বাদলা কাটলে প্রতিমা রং করার কাজ শুরুর পরিকল্পনা করছিলাম। মোট ১৪টি প্রতিমা রয়েছে সেখানে। তার মধ্যে ৮টি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। আমরা পুলিশকে বিষয়টা জানিয়েছি।' দুর্গাপূজার আগেই একদিকে সেদেশে দুর্গাপূজার মধ্যে নমাজ চলাকালীন লাউড স্পিকার ও ঢাক বাজানো যাবে না বলে সরকারি ফতোয়া, অন্যদিকে এই ঘটনায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের এহেন দ্বিচারিতা ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে সেদেশের হিন্দুদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা বা নির্বিঘ্নে পূজার বন্দোবস্ত করা আদৌ সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন থাকছেই। □

মানুষ আরজি কর কাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত চাইছে

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বলেছেন, আরজি কর কাণ্ডে তদন্তের নামে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যা করেছে তা তাঁরা দীর্ঘ ৩০ বছর বিচার বিভাগে থাকা সত্ত্বেও দেখেননি। বিচারপতিদের ইঙ্গিত স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আসলে তদন্তের নামে সমস্ত তথ্য প্রমাণ নষ্ট করার কাজটাই করছে।

সাধন কুমার পাল

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মানুষ হতাশ। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের অভিসন্ধি নিয়ে এ রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষের মনে সন্দেহ ছিল। সুপ্রিম কোর্টের ৯ আগস্টের নির্দেশে সেই আশঙ্কায় সত্যি প্রমাণ হলো যে, উনি মমতাকে বাঁচানোর জন্য স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে মামলাটি সুপ্রিমকোর্টে নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি মানুষ ছিঃ ছিঃ করছে। হোক না সুপ্রিমকোর্ট, মানুষের অনুভূতিকে সম্মান না জানাতে পারলে সুপ্রিমকোর্ট নিজের মর্যাদা হারাবে। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুপ্রিম কোর্ট জুনিয়র ডাক্তারদের বক্তব্য শুনলেন না। রাজ্য সরকারের দেওয়া একটা মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে ডাক্তারদের আন্দোলন তুলে দিতে বললেন। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ রাজ্য সরকারের উপর বীতশ্রদ্ধ।

এই সমস্ত প্রতিবাদ প্রতিরোধকে মমতা ব্যানার্জি সামান্যতম তোয়াক্কা করেন বলে মনে হয় না। এর প্রথম কারণ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মমতার সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের ৩০ শতাংশকে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে কোনোরকম প্রতিবাদ কর্মসূচির ধারে কাছে দেখা যাচ্ছে না। বরং ওদের প্রতিবাদীদের উপর ফোঁস কর্মসূচি বা ছোবল মেরে মমতা ব্যানার্জিকে এই উত্তাল পরিস্থিতি থেকে টেনে তোলার প্রয়াস করতে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ, আরজি কর কাণ্ডের শুরুর দিন থেকে মমতা ব্যানার্জি প্রশাসনিক বা রাজনৈতিকভাবে অতিসক্রিয় হয়ে সমস্ত প্রতিবাদ প্রতিরোধকে টপকে যাওয়ার সর্বোচ্চ প্রয়াস করে যাচ্ছেন। ঘটনা ঘটার পর শুরুর দিকে নিজে পথে নেমে 'নির্যাতিতার ফাঁসি চাই' বলে স্লোগান তুলেছিলেন। নির্যাতনকারীর ফাঁসি চাই বলতে গিয়ে হয়তো মুখ ফসকে নির্যাতিতার ফাঁসি চেয়েছিলেন। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন অপরাধীরা অপরাধ আড়াল করতে গিয়ে অতিরিক্ত চাপের মুখে এরকম ভুল হয়ে থাকে। সুযোগ পেলে মমতার পুলিশ হয়তো অপরাধীদের সাতদিনের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতো। কিন্তু বাদ সাধলো হাইকোর্ট। মহামান্য হাইকোর্ট মামলাটি সিবিআই-এর হাতে দিলেন। অবশ্য তার আগে পুলিশ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য ভবনের প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে প্রমাণ লোপাটের যাবতীয় ব্যবস্থা উনি করেই ফেলেছিলেন। শুধু বাকি ছিল ধৃত সঞ্জয়ের ফাঁসি বা এনকাউন্টার। এটা করে দিতে পারলেই সমস্ত বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যেত। মমতা যেদিন পথে নেমেছিলেন সেই দিন সেই প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন মমতা ব্যানার্জির কাছে ক্লিনচিট পাওয়া স্নেহধন্য আরজি করের প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষও। আসার পথে জেরার জন্য সিবিআই না তুললে সেদিন আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনরত মমতা ও সন্দীপকে একই ফ্রেমে দেখতে পাওয়া যেত। এর আগে রাজকুমার রায়, আনিস খান বা বগটুয়ের মতো নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলোকে উনি যেভাবে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিকভাবে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়েছেন, ঠিক একই কায়দায় আরজি কর কাণ্ডকেও ঠাণ্ডা ঘরে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হাইকোর্ট ও নাগরিক সমাজের ক্ষোভ বিক্ষোভে যখন সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে বুঝলেন তখন তিনি বেছে নিলেন ভীতি প্রদর্শন ও হুংকারের রাস্তা।

প্রতিবাদ ঘরে বাইরে

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনেরই বক্তব্য খুনি ধরা পড়ে গেছে সুতরাং সিবিআই ফাঁসিতে ঝোলাতে কেন দেরি করছে? সিবিআই জবাব দাও। এই পরিস্থিতিতে তাঁর নিজের দলের রাজ্যসভার সাংসদের মুখে ভিন্ন সুরের প্রশ্ন শুনে মমতা ব্যানার্জি তাকে বশে আনতে লালবাজারের পুলিশকে দিয়ে তাকে নোটিশ পাঠাতে হয়েছিল।

তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'-র সম্পাদক পদে রয়েছেন সুখেন্দুশেখর রায়। গত ১৪ আগস্ট মহিলাদের 'রাত দখল' কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়ে নিজেও প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন। সেদিন জোধপুর পার্কের নেতাজী মূর্তির সামনে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ধর্নায় বসেছিলেন তিনি। তবে এখানেই শেষ নয়, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলও আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে (তখনও গ্রেপ্তার হয়নি) নিয়ে জেরা করার দাবি জানিয়েছিলেন সিবিআইয়ের কাছে।

সুখেন্দু সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ''রাত দখলের সঙ্গেই বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার দখল করুক মানুষ। মর্যাদা নিয়ে বাঁচা সংবিধানের ২১ নম্বর মৌলিক ধারায় বর্ণিত।'' এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। কিছুদিন আগেই লিখেছেন,

''১৭৮৯ সালের জুলাই.... বিক্ষোভকারীরা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল

বাস্তিল দুর্গ। জন্ম হয়েছিল ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের???"

শুধু এইটুকুই লিখেছেন তিনি। তবে তাতেই যা বোঝানোর বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রাজনৈতিক রং লাগিয়ে প্রতিবাদীদের মুখ বন্ধ করার প্রয়াস

গত ২৮ আগস্ট, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা থেকে আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির কথা ফের বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই বিরোধীদের সমালোচনা করে। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''ফোঁস তো করতে পারেন। আপনারা ফোঁস করতে শিখুন।" পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল প্রতিবাদীদের ওপর তৃণমূলি হার্মাদদের তর্জন গর্জন ও মারপিটের ঘটনা। কেউ বলছেন জিভ ছিঁড়ে নেওয়ার কথা। ডাঙের বাড়ি মারার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন কেউ। দংশনের নিদান দিচ্ছেন কেউ কেউ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেই তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের এই ফোঁসের গর্জন শোনা যাচ্ছে। সেই তালিকায় তৃণমূল বিধায়ক যেমন রয়েছেন। আবার জেলা পরিষদের সদস্যও রয়েছেন।

কোচবিহার দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ আবার ফোঁস নয়, দংশনের নিদান দিলেন। দিনহাটায় তৃণমূলের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ''পরিকল্পিতভাবে বদনাম করা হচ্ছে। মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যাচার করা হচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে এসব বাড়তে থাকবে। তাই একবার কেউ দংশন করলে, পাঁচবার দংশন করতে হবে। ওরা যদি একটা দাঁত বসায়, পাঁচটা দাঁত বসানোর বন্দোবস্ত করতে হবে। তাহলে মিথ্যাচার বন্ধ হবে।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোঁস করতে বলেছেন জানিয়ে বিরোধীদের হুঁসিয়ারি দিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের তৃণমূল নেতা অতীশ সরকার। তৃণমূলের একটি সভায় বিরোধীদের হুঁসিয়ারি দিয়ে অতীশ বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোঁস করতে বলেছেন, সাবধান হয়ে যান। আমরা পাড়ায় পাড়ায় ফোঁস করলে, বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন তো? এখানেই না থেমে তিনি বলেন, '' আমরা যদি ফোঁস করি, আপনার বাড়ির মা-বোনদের সম্পর্কে কুৎসা রটিয়ে, বিকৃত ছবি করে যদি আপনার বাড়ির দরজায় টাঙিয়ে দিয়ে আসি, তাহলে ওই পোস্টারটা আপনি খুলতে পারবেন না। ওই দিনটা আসছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে গেলাম।"

মালদহ জেলা পরিষদের সদস্যা মর্জিনা খাতুন বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জাস্টিস চেয়েছেন। আমরাও সেটাই চাইছি। আর জি কর নিয়ে প্রতিবাদে নামলে এবার বিজেপি নেতা-কর্মীদের খুঁটিতে বেঁধে রাখব।" তৃণমূলের মালদহ জেলা সম্পাদক বুলবুল খান বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, ''বিজেপি নেতাদের চাপ দিতে হবে। বাড়ি বাড়ি ঘেরাও করতে হবে। জিজ্ঞাসা করতে হবে, দোয়ীদের ফাঁসি কবে হবে?"

গত ৩০ আগস্ট কোচবিহার জেলার দিনহাটা কলেজে ১৩ জন ছাত্রীকে তৃণমূলের ডাকে আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার জন্য শৌচালয়ে আটকে রাকা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এদিকে এই দিনহাটাতেই গত ১৪ আগস্ট রাত দখলের প্রতিবাদী আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী এক ছাত্রীকে সামাজিক মাধ্যমে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই সব ঘটনা তেকে এটা স্পষ্ট যে, মমতা ব্যানার্জি'র সাকরেদরা ফোঁস নয়, ছোবল মারতে শুরু করেছে। এদিকে লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল বিরোধীদের ওপর এবং হিন্দত্ববাদীদের ওপর যে ছোবল মেরেছিল তার রেশ এখনো শেষ হয়নি। এখনো বিজেপি সমর্থককে তৃণমূল নেতার বাড়িতে রেশন তুলে দিয়ে আসতে হয় অথবা রেশন দোকানে গিয়ে আঙ্গুলে ছাপ দিয়ে রেশন না নিয়ে ফিরে আসতে হয়। নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা খোলার জন্য প্রতিদিনই তৃণমূল নেতাকে মোটা টাকা তোলা দিতে হয়। অর্থাৎ এক ফোঁস শেষ না হতেই রাজ্যজুড়ে চলছে নতুন হুমকি ও আক্রমণ।

নিজের দলেই মমতার হুমকির প্রতিবাদ

এদিকে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে তৃণমূলের সাংসদ পদ ছাড়লেন জহর সরকার। এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও দিয়েছেন তিনি। শুরুতে এই আন্দোলনকে বাম-বিজেপির আন্দোলন বলে কাটাক্ষ করেছিলেন মমতা। সেই পথে হেঁটে তৃণমূলর ছোটোখাটো নেতারাও সেই দাবি করতে শুরু করেছিলেন প্রকাশ্যে। এই প্রবণতার নিন্দা করেছেন জহর সরকার। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছেন, ''আমি গত এক মাস ধৈর্য ধরে আরজি কর হাসপাতালের ঘৃণ্য ঘটনার বিরুদ্ধে সবার প্রতিক্রিয়া দেখেছি আর ভেবেছি, আপনি কেন সেই পুরনো মমতা ব্যানার্জির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছেন না। এখন সরকার যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা এককথায় অতি অল্প এবং অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।" তিনি লিখেছেন, ''আমার বিশ্বাস, এই আন্দোলনে পথে নামা মানুষেরা অরাজনৈতিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ করছেন। অতএব রাজনৈতিক তকমা লাগিয়ে এই আন্দোলনকে প্রতিরোধ করা সমীচীন হবে না। এঁরা কেউ রাজনীতি পছন্দ করেন না। শুধু একবাক্যে বিচার ও শাস্তির দাবি তুলেছেন।"

এই চিঠি প্রমাণ করলো মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রমাণ লোপাটে সরাসরি যুক্ত

অবশ্য এই হুমকির আগেই প্রমাণ লোপাটের সবচেয়ে বড়ো ঘটনাটি ঘটেছিল ঘটনার পরের দিন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ৯ আগস্ট আরজি করের সেমিনার রুম থেকে ট্রেইনি ডাক্তারের অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধারের পরদিন ১০ আগস্ট অর্থাৎ ধর্ষণ ও খুনের দ্বিতীয় দিনেই ঘটনার জায়গায় মানে 'ক্রাইম সিনে' নির্মাণ কাজ করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। চিঠিতে এও বলা হয়েছে যে, স্বাস্থ্যভবনের সম্মতিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১০ আগস্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং মেডিক্যাল এডুকেশনের ডিরেক্টরের সঙ্গে আরজি করের বোর্ড রুম মিটিংয়েই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সন্দীপের নির্দেশেই ক্রাইম সিনের পাশে শুরু হয় 'সংস্কার'।

এই চিঠি প্রকাশ্যে আসাতে এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে মুখ্যমন্ত্রী নিজে এবং ওনার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং তথ্য প্রমাণ লোপাটের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কারণ কয়েকদিন আগেই ওনারা প্রকাশ্যে সবাই দাবি করেছিলেন আরজি করের এই ভাঙ্গাভাঙ্গি ও সংস্কারের কাজের আদেশ নাকি ঘটনার অনেক আগেই দেওয়া হয়েছিল। মমতার মিথ্যাচারের শেষ নেই এই চিঠি প্রকাশ্যে আসার পর উনি নিজে বলছেন ডাক্তারদের থাকার সুব্যবস্থা করতেই নাকি এটা ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই ভাঙার নির্দেশ অসলে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেই এসেছিল।

বিধানসভায় আইন পাশ ও কোটি টাকার বিজ্ঞাপন আসলে দৃষ্টি ঘুড়িয়ে দেওয়ার আরেকটি অপপ্রয়াস

এখানেই শেষ নয়, বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে উনি ধর্ষণ বিরোধী করা আইন অপরাজিতা পাশ করালেন। তাঁর মতো কঠোর আইন পাশ করাতে না পারার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার পদত্যাগ চাইলেন। জনসভায় হুমকি দিলেন দিল্লিতে গিয়ে নাকি আন্দোলন করবেন যাতে কেন্দ্র সরকার কঠোর আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। নারী ও কন্যার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কী কী প্রকল্প নিয়েছেন, সেগুলি প্রচার করার জন্য জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম—ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম পৃষ্ঠার বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন ছাড়ছে। এটা মানতে হবে পরিস্থিতি গুলিয়ে দেওয়ার জন্যযদি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, তবে অবশ্যই সেই পুরস্কার পাবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

নিহত ডাক্তার বোনের পরিবার নগ্ন করে দিয়েছেন মমতা ও তার প্রশাসনকে

গত ৪ সেপ্টেম্বর, জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান আন্দোলনে এসে কার্যত একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ করেন নির্যাতিতার বাবা-মা ও কাকা-কাকিমা। বলেন, হাসপাতাল থেকে বলে দেওয়া হলো মেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কোনো মেডিক্যাল টেস্ট করা হলো না। সাড়ে তিনঘণ্টা মেয়ের মুখ দেখার জন্য সেমিনার হলের সামনে অপেক্ষা করতে হয়েছে। দীর্ঘ সময়ে একাধিকবার সবার কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। পুলিশের হাতে-পায়ে ধরছে ওর মা। কিন্তু কেউ কথা শোনেনি।

কেন এমন অবস্থা? এমনকী পুলিশ ও হাসপাতালও এফআইআর করেনি। আমার এফআইআর রেজিস্টার হলো ১১ টায়। কিন্তু কেন? প্রশ্ন অভয়ার বাবার। অভয়ার দেহ রেখে দিতে চেয়েছিলেন বলেও জানান নির্যাতিতার বাবা। কিন্তু কয়েকশো পুলিশ তাদের ঘিরে রেখেছিল। অভয়ার কাকা-কাকিমাও ক্ষোভ উগরে দেন। কাকা বলেন, একটা সাদা কাগজে দাদাকে দিয়ে সই করানোর চেষ্টা হয়েছিল। আমি তা দেখতে পেয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিই। কেন সই করানো হচ্ছিল? বিস্ফোরক অভিযোগ করেন কাকিমাও। বলেন দেহ দাহ করতে অতি সক্রিয় ছিল পুলিশ। আমাকে ধাক্কা মেরে পুলিশ বডি নিয়ে চলে যায়। এমনকী মেয়ের দেহ দাহ করার আগে পর্যন্ত তাঁদের পুলিশ ঘিরে রেখেছিল।

সুপ্রিম কোর্টও নগ্ন করে দিয়েছে মমতা প্রশাসনকে

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বলেছেন, আরজি কর কাণ্ডে তদন্তের নামে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যা করেছে তা তাঁরা দীর্ঘ ৩০ বছর বিচার বিভাগে থাকা সত্ত্বেও দেখেননি। বিচারপতিদের ইঙ্গিত স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আসলে তদন্তের নামে সমস্ত তথ্য প্রমাণ নষ্ট করার কাজটাই করছে। একটা বিষয় পরিস্কার যে, মমতা ব্যানার্জিরা দলবল নিয়ে রাস্তায় নেমে গগনভেদী চিৎকার করছে যাতে তথ্য প্রমাণ লোপাট করার বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি ঃ পরিস্থিতি গুলিয়ে দেওয়ার আরও একটি অপপ্রয়াস

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধর্ষণ নিয়ে কড়া আইন আনা ও দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে চিঠি লিখলেন। এই চিঠির জবাবে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী যে তথ্য তুলে ধরেছেন তাতে মমতা ব্যানার্জির মুখ লুকানোর কোনো জায়গা নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি করেছেন ধর্ষণ ও পকসো মামলার বিচার পরেক্রিয়া যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় সেজন্য ২০১৯ সালের অক্টোবরে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু করেছিল কেন্দ্র। চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত ৩০ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৭৫২ টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট কার্যকর হয়েছে। তার মধ্যে ৪০৯ টি কোর্টে শুধুই পকসো মামলার বিচার হয়। পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রথমে ১২৩ টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট অনুমোদন করা হয়েছিল। যার মধ্যে আবার ২০ টি শুধুমাত্র পকসো মামলার দ্রুত বিচারের জন্য রাখা হয়েছিল। বাকি কোর্টগুলিতেও ধর্ষণের পাশাপাশি পকসো মামলার বিচার হওয়ার কথা। এই চিঠিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও দাবি করেন, ২০২৩ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে একটিও ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু হয়নি।২০২৩ সালের অক্টোবরে কেন্দ্রকে চিঠি লিখে রাজ্য জানিয়েছিল তারা এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে চায়। সেই সময় ৭ টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সেই মতো লক্ষ্যমাত্রা পুনর্বিবেচনা করে কেন্দ্র সরকারের তরফে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৭ টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট অনুমোদিত হয়। ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত মাত্র ৬ টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট কার্যকর করা হয়েছে। রাজ্যে এখনও ৪৮,৬০০ টি ধর্ষণ এবং পকসো মামলার বিচার ঝুলে রয়েছে। তা সত্ত্বেও অনুমোদন দেওয়া ১১ টি কোর্ট মমতা সরকার চালু করতে পারেনি। কেন্দ্র সরকারের তরফে বারবার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও মহিলা (১৮১) এবং শিশুদের (১০৯৮) হেল্পলাইন নম্বর চালু করতে পারেনি। চালু করা হয়নি 'ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম'ও। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, নারী নির্যাতন রোখার জন্য দেশে যথেষ্ট কড়া আইন রয়েছে, কিন্তু তা কার্যকর করার বিষয়টি রয়েছে রাজ্যের হাতে।

মমতার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দিলেন নাগরিক সমাজ

এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা পৃথিবী যেভাবে সোচ্চার হয়েছে, তা এককথায় নজির বিহীন। এই প্রতিবাদের মিছিল থেকে বাদ যায়নি পাকিস্তান বাংলাদেশের মতো ইসলামিক দেশগুলিও। এবার রাজ্য, দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে আরজি কর কাণ্ডে বিচার চেয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন ছড়িয়েছে। ৬ টি মহাদেশের অন্তত ৩০ টি দেশে আরজি কর কাণ্ড ছায়া ছেলেছে। বিদেশের মাটিতে ১৩০ টি শহরে মানববন্ধন হয়েছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর আমেরিকা, বিট্রেনসহ ৯ টি দেশে হয়েছে মানববন্ধন কর্মসূচি। আমেরিকার ৩৪ টি জায়গায় মানুষ জমায়েত হয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছে বোস্টন, শিকাগো, নিউইয়র্ক সিটি, আটলান্টার মতো শহর। ব্রিটেনের ১৪ টি জায়গায় জমায়েত হয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। তার মধ্যে রয়েছে লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার, লন্ডনের মতো স্থান। এই দুই দেশের বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও আরও কয়েকটি দেশে আরজি কর কাণ্ডে বিচার চেয়ে পথে নেমেছিলেন সাধারণ মানুষ। আয়ারল্যান্ড, কানাডা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের রাজপথে নামবেন সাধারণ মানুষ। মানববন্ধনের মাধ্যমে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি জায়গায় স্থানীয় সময় বিকেল ৫ টায় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এটা অবিশ্বাস্য যে ব্রিটেন, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, কানাডা, জার্মানি, সুইৎজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, চেক প্রজাতন্ত্র, স্পেন, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, মেক্সিকো, ব্রাজিল, তাইওয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে মানুষ আরজি করের প্রতিবাদে পথে নেমেছেন। □

নাগরিক আন্দোলনের কমিউনিস্ট হাইজ্যাক

শ্যামাপ্রসাদোত্তর পশ্চিমবঙ্গের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির রাশ লক্ষ লক্ষ লাশ ফেলার বিনিময়ে নিজেদের হাতে রাখতে আজ পর্যন্ত যারা পেরেছে, এ রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতাপ্রাপ্তি ঠেকাতে তারা প্রয়োগ করবে সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ ইত্যাদি সর্ব প্রকারের কৌশল।

দেবযানী ভট্টাচার্য

এ লেখার শুরুটি করা যাক সাধারণ একখানি প্রশ্ন দিয়ে। কলকাতা শহরে পথের প্রতিবাদে মুখর হলেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, শ্রীলেখা মিত্রদের মতো অভিনেত্রীরা, কিন্তু আন্দোলনে অংশ নিতে চেয়েও সেখান থেকে বিতাড়িত হলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, যদিও প্রত্যেকেই এ রাজ্যে মমতার দাক্ষিণ্যধন্য অভিনেত্রী। এক যাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন শাসক ঘনিষ্ঠ অভিনেত্রীরা কেন পেলেন এহেন পৃথক ফল? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে ফিরে তাকাতে হবে কিঞ্চিৎ পিছনের দিকে।

পশ্চিমবঙ্গে এখন চলেছে প্রতিবাদের আবহ। গত ১৪ আগস্ট রাত দখলের ডাক দিয়ে শুরু হয়েছিল যে নাগরিক প্রতিবাদ আন্দোলন, তা বেড়েছে ধাপে ধাপে আর ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে, অতঃপর ভারত ছাড়িয়ে দেশের বাইরেও। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গত ৯ আগস্ট ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে ১৪ আগস্ট থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পথে নেমেছে প্রায় গোটা পশ্চিমবঙ্গ। রাজনীতির প্রত্যক্ষ ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চাওয়া যে শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালিকে পথের প্রতিবাদে নামতে দেখা যায়নি, আজ বহুকালের মধ্যে, আরজি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পথে নেমেছেন তাঁরাও। আর এহেন প্রতিবাদমুখর জনজাগরণের মুহূর্তে জেগে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক কুলকুণ্ডলিনীও।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মাথাচাড়া দেওয়া প্রত্যেকটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে হয় হত্যা করা হয়েছে বন্দুকের নলের জোরে (যেমন করা হয়েছিল ১৯৭৯-তে মরিচঝাঁপিতে, কারণ মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু মানুষেরা যা করেছিল তাও ছিল আদতে এক জাতীয়তাবাদী গণউত্থান) অথবা করা হয়েছে সেসব আন্দোলনের কমিউনিস্ট হাইজ্যাক, নানাবিধ মার্কসীয় উপায়ে, যেগুলিকে সহজ ভাষায় 'লোক ঠকানো উপায়' বললে তাত্ত্বিকদের হয়তো আপত্তি হবে, কিন্তু সাধারণ ছাপোষা মানুষের বোধ করি হবে না কোনোই আপত্তি।

১৯৫৩ সালের জুন মাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহের

কলকাতায় আগমনের আগের দিন রাত থেকেই কলকাতার রাস্তায় নেমেছিল মানুষের বন্যা। প্রিয় নেতাকে একবার শেষ দেখা দেখবেন বলে রাজ্যের মানুষ সারারাত জেগে অপেক্ষা করছিলেন রাস্তার ধারের ফুটপাথ ও ট্রামলাইনের উপর শুয়ে বসে। এহেন স্বতঃস্ফূর্ত জন-আবেগকে কমিউনিস্ট পার্টি হাইজ্যাক করেছিল শ্যামাপ্রসাদের মরদেহের কলকাতায় আগমনের দিন ১ পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল ধর্মঘট ডেকে।

অতঃপর, উনিশশো পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কট ও উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলায় জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে কলকাতার জাতীয়তাবাদী ভাবধারার মানুষেরা ১৯৬৪-র আগে শুরু করেন এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ আন্দোলন, এবং একই সময় পূর্ব পাকিস্তানের খুলনায় হিন্দুঘাতী রায়টের পর কলকাতায় যা ভয়াবহ এক প্রত্যাঘাতের রূপ তা দেখে প্রমাদ গুনে সেই আন্দোলনকে কমিউনিস্টরা হাইজ্যাক করে নকশালবাড়ি আন্দোলনের নামে। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি থেকে কমিউনিস্টরা শুরু করেছিল নির্বিচার এক মারামারি কাটাকাটির আন্দোলন, যে আন্দোলন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন যুবসমাজের দুই তিনটি প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতিকে।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে প্রথমে কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, তারপর সিপিএমের জ্যোতি বসুর সন্ত্রাসময় শাসনকাল। প্রায় তিন দশকব্যাপী কালখণ্ডটি ভেঙে দিয়েছিল বাঙ্গালির কোমর, কেড়ে নিয়েছিল কলজে ও কবজির জোর। অতঃপর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময় থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল রাজ্যে বর্তমানে পরিলক্ষিত হওয়া অরাজকতার প্রথম চরণ যা ২০১১ পরবর্তীকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় এসে হয়ে উঠেছে এমন যা দেখে কেবলই মনে পড়ে যায় 'ঠাকুমার ঝুলি'র 'লালকমল নীলকমল' গল্প অবলম্বনে নচিকেতা ঘোষের সুর করা

গীতিনাট্যের একখানি গানের একটি পঙ্‌ক্তি— 'সে কি পুরী রাজ্য জোড়া, রাক্ষস রাক্ষসী ভরা...'। এইভাবে সন্ত্রাস কায়েম করা এবং আন্দোলন হাইজ্যাক করার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে লাগাতার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল মার্কসিস্ট, লেনিনিস্ট, মাওয়িস্ট ইত্যাদি কমিউনিস্ট ভাবধারার মানুষেরা। আজ, আরজি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের আবহে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে তারা সকলেই।

সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ চিরকাল থেকেছে বামেদের হাতে। অর্থাৎ রাজ্য থেকেছে এই একই পলিটিক্যাল ভাবধারার ব্র্যাকেটের মধ্যে যেখানে সময়ে সময়ে শুধু বদলে গিয়েছে নেতৃত্বের মুখটি। কখনও বাংলা কংগ্রেস, কখনো কংগ্রেস (R), কিংবা কংগ্রেস (I), কখনো কখনো-বা বামফ্রন্ট তথা সিপিএম, আবার কখনো তৃণমূল হয়েছে এদের ফেস বা মুখ। মুখ বদল হলেও রাজনৈতিক ভাবধারার বদল এরাজ্যে হয়নি ১৯৬৭-র পর আর কখনোই। এবারও, আরজি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, সেই একই বৃহত্তর বাম ব্রিগেডের লোকেরা নেমেছে ক্ষমতা একই হাতে রেখে ক্ষমতার নেতৃত্বের ফেস বদলের খেলায়। এবার তারা মমতার ফেসকে সরিয়ে আনতে চায় নতুন কোনো ফেস যে ফেস হতে পারে সিপিএম-এর বা আইএসএফ-এর কিংবা সিপিআই-এমএল-এর অথবা এআই-এসএ-র অথবা হতে পারে রাহুল গান্ধীর থিয়োরি অনুযায়ী দলিত বা ওবিসি ফেসও। ফেস বদলের এহেন খেলায় এবারকার পাবলিক মুভমেন্টকেও হাইজ্যাক করতে চায় তারা এবং সেহেন হাইজ্যাকের প্রয়াসের লক্ষণগুলিও স্পষ্ট। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধকে এবারও এরা গাঁথতে চায় মার্কসীয় সূত্রে।

তাই বুঝি কলকাতার রাজপথে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়রা তুলছে কুখ্যাত সেই 'আজাদি' স্লোগান, তুলছে নারী ও পুরুষের যৌন সমকামিতার স্বাধীনতার দাবি যা কিনা বর্তমান সময়ে পদ্ধতিগত ব্রেনওয়াশের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্রমাগত গুঁজে দেওয়া হচ্ছে সদ্য কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীদের মস্তিষ্কে (যে জিনিস সহ্য করতে না পারার কারণেই বুঝি-বা ২০২৩-এর আগস্ট মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে রহস্যজনক মৃত্যু হয় স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর)। কালচারাল মার্কসবাদের এ জাতীয় প্রয়োগ বামেরা করছে সচেতনভাবে, ভিন্ন নামে ভিন্ন কোনো মুখকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতার রাশ নিজেদের হাতেই ধরে রাখার উদ্দেশ্যে।

পাবলিক মুভমেন্টের এহেন হাইজ্যাকিঙে এরা ব্যবহার করতে চাইছে সেই সব অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, নাট্যকার প্রভৃতি বিনোদন জগতের মানুষদের, মমতা-জমানায় যারা মমতার দাক্ষিণ্য পেয়েও নিজেদের আইডেন্টিটি বজায় রাখতে পেরেছে সিপিএমের ফেস হিসেবেই, যেমন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় বা শ্রীলেখা মিত্র। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত যতটা মমতার দাক্ষিণ্য পেয়েছে, স্বস্তিকা বা শ্রীলেখারাও পেয়েছে ততটাই। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া অনুযায়ী এবং বৃহত্তর বাম লবির আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য বজায় রাখার স্বার্থে স্বস্তিকা, শ্রীলেখাদের ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে সিপিএম ঘরানার অভিনেত্রী তথা অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে, আর ঋতুপর্ণা

সেনগুপ্ত ব্র্যান্ডেড হয়েছে মমতা ঘরানার অভিনেত্রী হিসেবে। তাই আজকের প্রতিবাদ মঞ্চে ঋতুপর্ণা ব্রাত্য, আর স্বস্তিকারা স্বাগত।

উপরন্তু, অভিনেত্রী আইডেন্টিটির পাশাপাশি যে অ্যাক্টিভিস্ট ইমেজ শ্রীলেখা ও স্বস্তিকার ক্ষেত্রে তৈরি করা হয়েছে, ঋতুপর্ণার তা নেই। তাছাড়া নিজেদের যৌনতার রগরগে উপস্থাপনার কারণে স্বস্তিকা ও শ্রীলেখার রয়েছে জনপ্রিয় একখানি 'নগরনটী' ভাবমূর্তিও, যে ভাবমূর্তি ঋতুপর্ণার নেই। অর্থাৎ কালচারাল মার্কসিজমের প্রসারে নগরনটী ভাবমূর্তির স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, শ্রীলেখা মিত্ররা অধিকতর উপযুক্ত, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ততখানি নন। উপরন্তু, মমতা ঘরানার অভিনেত্রী হিসেবে ঋতুপর্ণার গায়ে লেগে রয়েছে নানা প্রকার মানি লন্ডারিং স্ক্যামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কলঙ্ক, সেই রোজভ্যালি স্ক্যামের সময় থেকে শুরু করে আজকের রেশন স্ক্যাম পর্যন্ত নানা সময়ে, নানা ধাপে।

মমতা ঘরানার সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে স্ক্যামের কালি সরাসরি গায়ে মাখার বিষয়টিতে ছুঁতমার্গ রাখলে যে চলে না সে সত্যটি বোধ করি বর্তমানে সর্বজনবিদিত। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত সব লোককেই বোধ করি ব্যবহার করেন 'টাকা করা'র ঘুঁটি হিসেবে, কারণ তাঁর কাছে রাজনীতি ও ক্ষমতার ধারণাটিই বুঝি-বা সেই প্রকার। তাই আজ যখন আরজি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাস্তায় নেমেছে পাবলিক, নেমেছে রাত দখলের অভিযানে, গর্জে উঠেছে মমতার শাসনতন্ত্রের উৎকট চেহারার বিরুদ্ধে, পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর বাম ব্রিগেড তখন তৎপর হয়ে উঠেছে ক্ষমতার ফেস হিসেবে আপাতত মমতাকে এবং মমতা ঘরানার সকলকে সরিয়ে অ-মমতা বামেদের ফেসকে সামনে আনতে। তাই জনপ্রতিবাদ মঞ্চে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে ঢুকতে দেওয়া হলো না, অথচ ওই একই অভিনয়-ইন্ডাস্ট্রিতে মমতারই দাক্ষিণ্যে করে খাওয়া স্বস্তিকা- শ্রীলেখাদের ঢুকতে দেওয়া হলো এবং 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের জন্মভূমিতে তাদেরকে তুলতে দেওয়া হলো বিচ্ছিন্নতাবাদ তথা সন্ত্রাসবাদের দ্যোতক 'আজাদি' স্লোগান।

একই পরিণতি হলো নচিকেতা চক্রবর্তীরও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এমনভাবেই নিজেকে জড়িয়েছেন তিনি এবং পাবলিক তাঁকে 'চটিচাটা' বলে প্রত্যাখ্যানও করেছে এমনভাবে যে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর বাম ব্রিগেড স্বস্তিকা-শ্রীলেখাদের পাশে তাকে দাঁড়াতে দিতে ইতস্তত করছে। ঋতুপর্ণা, নচিকেতারা এখন চেয়েও পারছেন না গণপ্রতিবাদের পরিসরের মধ্যে ঢুকতে, কারণ এই মুহূর্তে বৃহত্তর বাম লবির পরিকল্পিত স্ট্র্যাটেজি হলো এই ফেস বদলের খেলা। অতিবাম মমতা তাই অ-মমতা বামেদের কাছে এখন অচ্ছুত। তারা চায় এমন মুখগুলিকে সামনে আনতে মমতার সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ সংস্রব তেমন নেই।

তবে এতসবের মধ্যেও একজন অভিনেত্রী তথা চিত্রপরিচালক এমন আছেন যিনি ২০১১ পূর্বকাল থেকে পূর্ণত মমতার প্রত্যক্ষ সংস্রবে থাকা সত্ত্বেও, মাওবাদীদের সঙ্গে বোঝাপড়া তৈরিতে মমতার সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও এবং চিটফান্ড স্ক্যামে মমতার হয়ে হাত কালো করা সত্ত্বেও অ-মমতা বামেদের কাছে (পড়ুন সিপিএম-এর কাছে) ব্রাত্য নন। তিনি অপর্ণা সেন। সেই কারণেই আরজি কর হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিবাদ মঞ্চে অপর্ণা সেন উপস্থিত হওয়ার পর সেখানে উপস্থিত সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের কাছ থেকে 'চটিচাটা' স্লোগান খেয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হওয়ায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সিপিএমের রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে ফতোয়া জারি করেন যে অপর্ণা সেন, অঞ্জন দত্ত, অরিজিৎ সিংহ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়দের উপহাস বা ব্যঙ্গ করা চলবে না, বরং তাঁদের মমতা-ঘনিষ্ঠতা উপেক্ষা করেও তাঁদেরকে গ্রহণ করতে হবে সাদরে।

অরিজিৎ সিংহ তাঁর নিজ যোগ্যতায় ও সংগীত দক্ষতায় বলিউডের এক নম্বর গায়ক। তাঁর সাফল্য পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক নয়। ফলে তাঁকে সরিয়ে রাখলে তাঁর নিজস্ব ব্র্যান্ড ভ্যালুর গৌরবের ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে বামেরা নিজেরাই, যা অতি স্বাভাবিকভাবেই তারা চায় না। অন্যদিকে, অভিনেত্রী হিসেবে অপর্ণা সেনের ক্ষেত্রটি বাংলা সিনেমার আঞ্চলিক ক্ষেত্র হলেও চিত্র পরিচালক হিসেবে তিনি জাতীয় খ্যাতি সম্পন্না এবং পরিচালনা করেছেন হিন্দি ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রও। উপরন্তু, অপর্ণা সেন নির্মিত চলচ্চিত্রগুলি ধারাবাহিকভাবে বহন করেছে ফেমিনিজমের বার্তা এবং 'মি. অ্যান্ড মিসেস আইয়ার'-এর মতো কোনো কোনো চলচ্চিত্র প্রতীত হয়েছে এমনকী কালচারাল মার্কসিজমের প্রোপাগান্ডা ফিল্ম হিসেবেও। এমন একজন ডেডিকেটেড জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন মার্কসীয় বিচারধারার রিসোর্স পার্সনকে কেবলমাত্র মমতা ঘনিষ্ঠ এবং চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে হাত কালো করেছেন বলে ত্যাগ করতে রাজি নন মহম্মদ সেলিমরা। অনুরূপভাবে, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ও এমন একজন চিত্র পরিচালক যিনি কিনা মমতার দাক্ষিণ্যধন্য হয়েও নিজের আইডেন্টিটি ধরে রেখেছেন 'সিপিএমের লোক' হিসেবেই এবং তৈরি করেছেন ইসলামোলেফটিস্ট ভাবধারার বহু প্রোপাগান্ডা ফিল্ম। এ জিনিস সম্ভব হয়েছে, কারণ এরাজ্যে বাম মানে কেবল সিপিএম নয়, বরং বৃহত্তর বাম ব্রিগেড যার মধ্যে ঢুকে রয়েছে বাম, মমতা, নকশাল, কংশাল, কংগ্রেস— সবাই।

এদের সকলের রাজনৈতিক ভাবধারা যেমন এক, এদের সকলের শত্রুও তেমন এক ও অদ্বিতীয়। আর তা হলো ভারতীয় জনতা পার্টি তথা রাষ্ট্রীয় বিচারধারার সংগঠন। যেনতেনপ্রকারেণ বিজেপিকে তাই রুখতে চায় তারা। স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির রাশ লক্ষ লক্ষ লাশ ফেলার বিনিময়ে নিজেদের হাতে রাখতে আজ পর্যন্ত যারা পেরেছে, এ রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতাপ্রাপ্তি ঠেকাতে তারা প্রয়োগ করবে সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ ইত্যাদি সর্ব প্রকারের কৌশল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সজাগ ও সচেতন থাকা প্রয়োজন। বাঁচতে হলে এবার আর বামেদের দ্বারা নিজেদের আবেগ ও প্রতিবাদকে হাইজ্যাক হতে দিলে চলবে না। বামেদের হাত থেকে বাঁচার শেষ সুযোগ তাদের সামনে সমুপস্থিত। □

হিমন্ত বিশ্বশর্মা তাঁর আগামী আর প্রায় এক বছরের কার্যকালে যদি এই কাজটি করে যেতে পারেন, তাহলে রাজ্যের ইতিহাসে এটুকু অন্তত লেখা থাকবে— এই হিন্দুত্বের পোস্টারবয় মানুষটি নানা অবজ্ঞা, কটূক্তি ও অশালীন আক্রমণ উপেক্ষা করেও উগ্র মোল্লাবাদের মোকাবিলায় সেই কাজটি করেছেন— যা জেএনইউ শিক্ষিত বা হার্ভার্ড ফেরত বামপন্থী এবং নেহরুপন্থীরা পারেননি।

অসমে ইউনিফর্ম সিভিল কোড শীঘ্রই কার্যকর হতে চলেছে

ধর্মানন্দ দেব

সমগ্র দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে হবে— এ দাবিটি দেশের রাষ্ট্রবাদী মানুষ ও ভারতীয় জনতা পার্টি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। দেশের আর কোনো রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক পক্ষ, এমনকী স্বঘোষিত প্রগতিশীল, সেকুলার, বাম, অতিবামপন্থীরাও কখনও এই দাবির সমর্থনে কোনো কথা বলেননি। এই দাবিটি যে খুব অন্যায্য, অযৌক্তিক বা অন্যায়, তা কিন্তু বলা যাবে না। বরং যদি খোলা মনে যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায়, তাহলে বোঝা যাবে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ভারতীয় মুসলমান সমাজকে, বিশেষ করে মুসলমান মহিলাদের, মোল্লাবাদের কারাগার থেকে মুক্তি দিতে পারবে। এছাড়াও উগ্র মোল্লাবাদকেও যথাযথ প্রতিহত করতে পারবে। ভারতের মতো দেশ, যে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে— সেই দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োগ তো অবশ্য জরুরি। কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর অবশ্যই বিজেপি চেষ্টা করেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োগের জন্য। এই উদ্যোগটুকু যে শুরু হয়েছে তা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। তাইতো আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্বাধীনতার আগে গোয়া রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োগের পর স্বাধীন ভারতে প্রথম উত্তরাখণ্ড রাজ্যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড বলবৎ হয়েছে। আর এই অভিন্ন দেওয়ানির কথা বিজেপি বলেছে এমন রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম রাজ্য হচ্ছে অসম, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, গুজরাট ইত্যাদি।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধিটি চালু হওয়া কেন প্রয়োজন? প্রয়োজন মুসলমান মহিলাদের আত্মসম্মান এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তার কারণেই। মুসলমান দুই বিদ্রোহিনী মহিলার ঘটনা শুধুমাত্র উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে শরিয়তি আইনের নিগড়ে মুসলমান মহিলারা কতটা অসহায়। অর্থাৎ শাহবানো থেকে সায়রা বানো। ১৯৮৫ ও ২০১৭। আর দু'টিই রায় প্রদান করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিমকোর্ট। দুটি রায়ই প্রদান করে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ। দুটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে নারী। একজন শাহবানো আর অপরজন সায়রা বানো। দু'জনেই বৈবাহিক জীবনে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন এবং বিচার পেতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কড়া পর্যন্ত নাড়তে হয়েছে তাদের। আর সুপ্রিমকোর্ট এদের কাউকেই নিরাশ করে বাড়ি পাঠায়নি বলা যায়। মুসলমান মহিলাদের অধিকারকে বিধিবদ্ধ আইনে রূপ দেওয়ার উদ্যোগ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। শরিয়ত আইনের তকমা দিয়ে তিন তালাক প্রথা (তালাক-ই-বিদ্দাত), নিকা হালালা এবং বহু বিবাহ প্রথাকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক এবং চরম লিঙ্গ বৈষম্যমূলক বলে অবিলম্বে এই আইন রদ করার জন্য ভারতীয় মুসলমান নারী সমাজ এবং মুসলমান সংগঠনগুলি সুপ্রিমকোর্টে আর্জি রেখেছিল। বহুদিনের অপেক্ষা-রত মুসলমান নারীদের এই অধিকার রক্ষার দাবিটি উত্থাপিত হয়েছিল মুসলমান নারীসমাজ থেকেই। 'ভারতীয় মুসলমান মহিলা আন্দোলন' মুসলমান মহিলাদের অধিকার রক্ষাকে বিধিবদ্ধ করার দাবি

করেছিল। সুপ্রিমকোর্ট ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে তিন তালাক অসাংবিধানিক বলে রায় প্রদান করে। ২০১৭ সালের ২২ আগস্ট সুপ্রিমকোর্ট রায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে আইন তৈরির অনুরোধ জানায়। কিন্তু তিন তালাক অবৈধ বলে দেশের সুপ্রিমকোর্টের ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের নির্দেশের পরেও তাৎক্ষণিক তালাক প্রথা জারি ছিল ভারতের বিভিন্ন অংশে। যেমন ভোজপুরী অভিনেত্রীর ঘটনা। ওই অভিনেত্রীর মতে তাঁর স্বামী নাকি তাঁকে স্ট্যাম্প পেপারে তালাকনামা পাঠিয়েছেন। তাই ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে মোদী সরকার তিন তালাক বিল লোকসভায় পেশ করে এবং ধ্বনি ভোটে লোকসভায় পাশ হয়।

কিন্তু সেইসময় রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় সমর্থন আদায় করতে পারেনি মোদী সরকার। বিলটি সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর দাবি জানান বিরোধী সাংসদরা। ভোট-ব্যাংকের রাজনীতির জন্যই কংগ্রেস এই বিলকে সমর্থন করেনি রাজ্যসভায়। তারপর বাধ্য হয়ে ২০১৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ তিন তালাক নিয়ে অর্ডিন্যান্স আনে। সেই অর্ডিন্যান্সকে আইনে পরিবর্তন করতে ২০১৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর আবার লোকসভায় মোদী সরকার তিন তালাক বিল- ২০১৮ পেশ করে এবং লোকসভায় পাশ হয়। কিন্তু রাজ্যসভায় বিরোধীদের প্রতিবাদে পাশ হয়নি এবং ষোড়শ লোকসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন তালাক বিলের মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনরায় তিন তালাক নিয়ে অর্ডিন্যান্স ইস্যু করা হয়েছিল। তাই মোদী সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় যখন আসে তখন তিন তালাক বিল পুনরায় লোকসভায় পেশ করে এবং লোকসভায় তিন তালাক বিল পাশ হয়। তারপর বহু প্রতীক্ষিত তিন তালাক বিল রাজ্যসভায় পাশ হয়। এখন তাৎক্ষণিক তিন তালাক মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অপরাধ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। তাই তাৎক্ষণিক তিন তালাক অসমেও নিষিদ্ধ। আর এখন অসমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার পথে একধাপ এগিয়ে গেল, কেননা পূর্ব ঘোষণামতো সম্প্রতি বিধানসভায় অসম রিপিলিং বিল, ২০২৪ পাশ হয়েছে অর্থাৎ মুসলমান বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন আইন, ১৯৩৫ বাতিল হয়েছে অসমে। আর বিধানসভায় পাশ হয়েছে বাধ্যতামূলক মুসলমান বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিস্ট্রেশন বিল, ২০২৪। এই বিলের লক্ষ্যই হলো রাজ্যে বাল্যবিবাহ রোধ করা। সম্প্রতি অসম সরকারের শুল্ক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী যোগেন মোহন অসম বিধানসভায় বাধ্যতামূলক মুসলমান বিবাহ রেজিস্ট্রেশন এবং বিবাহবিচ্ছেদ বিল, ২০২৪ পেশ করেন।

এখন অতি সংক্ষেপে দেখে নিই বাতিল হওয়া ১৯৩৫ সালের আইনে কী ছিল? ১৯৩৫ সালে, শাদুল্লাহ সরকার শিলঙের অসম বিধানসভায় অসম মুসলমান বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ আইন পাশ করে। এই আইনটি কার্যকর হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে অর্থাৎ যেদিন আইনটি অসম গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। আইনটিতে ছিল মোট ২৫টি ধারা। এই আইন কাজিদের মুসলমান বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করেছে। কাজির মতো বেসরকারি ব্যক্তির হাতে মুসলমান বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষমতা ছিল। বাল্য বিবাহকে পরোক্ষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কেননা বাতিল আইনের ৮ (১) ধারায় বলা ছিল স্পষ্ট এরূপ : 'by the parties to the marriage jointly provided that if the bridegroom or the bride, or both, be minors, application shall be made on their behalf by their respective lawful guardians and provided further that, if the bride be pardanasheen, such application may be made on her behalf by her duly authorised Vakil.' অন্যদিকে যেসব পুরুষ একাধিকবার বিয়ে করেছেন তারাও এই আইনের মাধ্যমে তাদের বিয়ে নিবন্ধন করতে পারতেন।

অসম রাজ্যের মধ্যে মুসলমানদের বিবাহ বিচ্ছেদ বাধ্যতামূলক ভাবে নিবন্ধন করার ব্যবস্থার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও অসমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং পুরুষদের জন্য বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ২১ বছর এবং মহিলাদের জন্য ১৮ বছর নির্ধারণ করা এবং উভয় পক্ষের সম্মতি ছাড়া বিবাহ প্রতিরোধ এবং বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ করা, বিবাহিত নারীদের বিবাহিত জীবনের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির অধিকার সুনিশ্চিত করা, বিধবাদের উত্তরাধিকারের অধিকার এবং অন্যান্য সুবিধা দাবি করতে সক্ষম করা, বিবাহ পর তালাক দেবার প্রবণতা নিরুৎসাহিত করা এবং সামগ্রিকভাবে বিবাহের প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার জন্য নতুন আইনের প্রয়োজন ছিল। কোরানের ভাষায় বিবাহ মানবজীবনের একটি বলিষ্ঠ অঙ্গীকার। তার জন্যই রাজ্যের আইন প্রণেতারা নতুন আইন প্রণয়ন করেন। সপ্তম শতাব্দীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যে আইন জরুরি ছিল, এ যুগে তার সংস্কার দরকার, সেটা বুঝেছে বিশ্বের বহু মুসলমান বা ইসলামি দেশ।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মেয়েদের আরও সুবিধা দান করে। ১৯৪৬ সালে মিশরে 'বিল অব টেস্টামেন্টারি ডিসপোজিশন' প্রবর্তন করা হলো, এই আইনের বিধান ১৯৫৩ সালে সিরিয়ায়, ১৯৫৭ সালে টিউনিশিয়ায় এবং ১৯৫৮ সালে মরক্কোতে গৃহীত হয়েছে। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানে মুসলমান পারিবারিক আইন সংস্কার হয়েছে। কিন্তু অসমে নতুন আইন প্রণয়ন হতেই 'ধর্মের নামে রাজনীতীকরণ'-এর ফাঁদে এই আইনকে আটকানোর এক অপচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি অসম বিধানসভায় পাশ হয় The Assam Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorces Bill, 2024। ওই বিলে রয়েছে মোট ২৬টি ধারা। সামাজিক মর্যাদা এবং আইনগত অধিকার রক্ষার জন্যই বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা অতি জরুরি। রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত যে কেউ আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। মুসলমান পারিবারিক আইন অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রেশন একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সাক্ষ্যগত মূল্য বহন করে। রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত বিবাহ প্রমাণ করা কঠিন। ফলে মেয়েদের প্রতারিত হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় সবচেয়ে বেশি।

দেনমোহর, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার নির্ণয়, সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি দাবির ক্ষেত্রে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইনগত দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব

ব্যাপক। বিবাহিত নারী-পুরুষ উভয়ের ভবিষ্যৎ ও আইনগত অধিকার সংরক্ষণ করে। বিবাহ সম্পর্কে উভয়পক্ষ থেকেই যে কোনো সময় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, তখন রেজিস্ট্রেশন প্রমাণপত্র হিসেবে কাজ করবে। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করলে আইনগত কিছু সুফল পাওয়া যায় কিন্তু রেজিস্ট্রেশন না করলে কুফলও রয়েছে অনেক, যেমন রেজিস্ট্রেশনের ফলে— ১. উভয়পক্ষের বিবাহ অস্বীকার করার আইনগত সুযোগ থাকে না এবং এর দ্বারা সামাজিক ও পারিবারিক দায়বদ্ধতা আরোপিত হয়। ২. রেজিস্ট্রেশনের ফলে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নির্ণয় সহজ হয়। ৩. স্ত্রী তার প্রাপ্ত দেনমোহর ও ভরণপোষণ আদায় বা দাবি করতে পারে। ৪. সন্তানের অভিভাবকত্ব নির্ণয় করা সহজ হয়। ৫. স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হলে স্ত্রী আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন। ৬. রেজিস্ট্রেশনের ফলে বাল্যবিবাহ রোধ সম্ভব হয়। ৭. রেজিস্ট্রেশনের ফলে স্ত্রী ডিভোর্স দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হতে পারে। অন্যদিকে, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না হলে স্বামী বা স্ত্রীর আইনগত বৈধতা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য, অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণ করা যায় না।

রেজিস্ট্রেশন না হওয়ার ফলে স্বামী অথবা স্ত্রী উভয়ই আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত বা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আবার, রেজিস্ট্রেশন না করা আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে। মোট কথা, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন একদিকে যেমন বাধ্যতামূলক, অন্যদিকে এটি একটি সামাজিক ও পারিবারিক প্রামাণ্য দলিল। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে সরকারিভাবে বিবাহকে তালিকাভুক্তি করা। সরকার নির্ধারিত ফর্মে বিবাহের তথ্যাবলী দিয়ে এই তালিকাভুক্তি করতে হয়। যেহেতু বিয়ের একমাত্র লিখিত প্রমাণ বা ডকুমেন্ট হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন, সেহেতু বিয়ে সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় এর প্রয়োজন হয়। এমনও হতে পারে যে বিয়ে বৈধ না অবৈধ বা বিয়ে নিয়ে কোনো সন্দেহ দেখা দেয় সেক্ষেত্রেও রেজিস্ট্রেশন বিয়ের শক্ত একটি প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। বিয়ের পরে বিভিন্ন রকম সমস্যা যেমন স্ত্রী ও সন্তানকে কোনো কারণ ছাড়া ভরণপোষণ না দিলে, স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে আরেকটি বিয়ে করলে বা স্ত্রীকে তালাক দিলে, দেনমোহর থেকে বঞ্চিত করলে, প্রতারণা করে বিবাহিত অবস্থায় আবার কাউকে বিয়ে করলে। এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী আদালতে কোনো নালিশ করতে চাইলে প্রথমেই বিয়ের প্রমাণ হিসেবে রেজিস্ট্রিকৃত নিকাহনামা আদালতে জমা দিতে হবে। কেউ নিজের বিয়ে ইচ্ছামতো অস্বীকার করতে চাইলেও বিয়ে রেজিস্ট্রি করে রাখার কারণে তা পারবে না।

নতুন The Assam Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorces Bill, 2024-এর ২ (ডি) নম্বর ধারায় বিবাহের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে— বিবাহ মানে ''এই আইন প্রবর্তনের আগে বা পরে চুক্তিবদ্ধ হোক না কেন দুই মুসলমান ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ এবং স্বামী/স্ত্রীর যে কোনো একজনের মৃত্যু হলে বা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে পুনর্বিবাহকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং 'নিকাহ' বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করে যার মাধ্যমে দু'জন মুসলিম পার্সোনাল ল' এবং ইসলামিক আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করে ব্যক্তিদের স্বামী-স্ত্রী করা হয়।'' এই আইনের ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, আইন কার্যকর হওয়ার আগে বা পরে প্রতিটি মুসলমান বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে হবে এবং রেজিস্ট্রি করার জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। শর্তগুলি হচ্ছে— ১. উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহের একটি অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছে এবং বিবাহের আনুষ্ঠানিকতার পর থেকে তারা স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে একসঙ্গে বসবাস করছে; ২. দুই পক্ষই বিবাহের তারিখের আগে কমপক্ষে ৩০ দিন ধরে বিবাহ ও তালাক নিবন্ধকের এক্তিয়ারাধীন জেলার মধ্যে বসবাস করছে; ৩. বিবাহের পাত্র-পাত্রী বিবাহের তারিখে মেয়েদের ক্ষেত্রে আঠারো বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর পূর্ণ করেছেন, ৪. উভয় পক্ষের অবাধ সম্মতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে; ৫. বিবাহের কোনো পক্ষই বিবাহের অনুষ্ঠানের সময় অযোগ্য বা উন্মাদ বা মানসিক ভারসাম্যহীন নয়; ৬. পাত্র-পাত্রী যে কোনো ধরনের আইনি অক্ষমতা থেকে মুক্ত, অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী শরিয়ত বা মুসলমান আইন অনুযায়ী সম্পর্কের নিষিদ্ধ মাত্রার মধ্যে থাকবে না; ৭. বিবাহের আবেদন নির্ধারিত ফর্মে হতে হবে যা নিম্নলিখিত নথিগুলির সঙ্গে থাকবে;— (ক) বিবাহের পক্ষের পরিচয় প্রমাণপত্র; (খ) বয়সের প্রমাণপত্র; (গ) বাসস্থানের প্রমাণপত্র। এছাড়াও বিয়ের জন্য উভয় পক্ষের একটি ঘোষণাপত্র দিতে হবে।

ওই আইনের ১২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে আদালত থেকে মুসলমান বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি পাওয়ার একমাসের মধ্যে সেটাও রেজিস্টার্ড করতে পারেন। আর সেই বিবাহ বিচ্ছেদের রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রাপ্তির পর, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধক (ক) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদ কার্যকর হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে তাদের দ্বারা এই ধরনের তালাক কার্যকর হয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে নিবন্ধক। (খ) নিবন্ধকের সামনে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে তাঁকে সন্তুষ্ট হতে হবে। যদি বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধক উপরোক্ত বিষয়গুলিতে সন্তুষ্ট হন এবং অন্যথায় না হন, তাহলে তিনি তালাক নিবন্ধন বইতে বিবাহ বিচ্ছেদের সেইমতে এন্ট্রি করবেন। তবে নিবন্ধন চাওয়া আবেদনকারীদের উপস্থিতিতে এবং তাদের স্বাক্ষর পাওয়ার পর এন্ট্রি করবেন, অন্যথায় এই ধরনের কোনো এন্ট্রি করা যাবে না। এক কথায় বলা যায়, এই আইন অসমে কার্যকর হলে অনেক কাজি যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রায়ই অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ে ও তালাকের অনুমতি দেন, সেটা আর সম্ভব হবে না। কথায় আছে মিঞা বিবি রাজি, তো ক্যয়া করেগা কাজি।

তাই বলতে বাধা নেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োগে এক ধাপ এগোলো। সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল, মুক্ত চিন্তার অধিকারী একটি ভারতীয় সমাজের স্বার্থেই অসমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হওয়া প্রয়োজন। এটি সময়ের দাবি। এই সময়ের দাবিকে উপেক্ষা করা যাবে না। হিমন্ত বিশ্বশর্মা তাঁর আগামী আর প্রায় এক বছরের কার্যকালে যদি এই কাজটি করে যেতে পারেন, তাহলে রাজ্যের ইতিহাসে এটুকু অন্তত লেখা থাকবে— এই হিন্দুত্বের পোস্টারবয় মানুষটি নানা অবজ্ঞা, কটূক্তি ও অশালীন আক্রমণ উপেক্ষা করেও উগ্র মোল্লাবাদের মোকাবিলায় সেই কাজটি করেছেন— যা জেএনইউ শিক্ষিত বা হার্ভার্ড ফেরত বামপন্থী এবং নেহরুপন্থীরা পারেননি।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ
বাঙ্গালির হিন্দুত্বের নবজাগরণের সময়পর্ব

অভিমন্যু গুহ

খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে রামমোহন রায়কে যতটা উৎপীড়িত হতে হয়েছিল, সমকালে কিংবা পরবর্তীকালেও আর কাউকেই বোধহয় এতটা হেনস্থা হতে হয়নি। তাঁর 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (The Brahmunical Magazine --- the Missionary and the Brahmun) পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্যই ছিল খ্রিস্টান মিশনারিদের হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দেওয়া। তিনি শ্রীরামপুরের মিশনারিদের পত্রিকা সমাচার দর্পণের হিন্দু বিরোধী মনোভাবের নিন্দা করে তাঁর ওই পত্রিকা প্রকাশের কারণ জানাতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন—

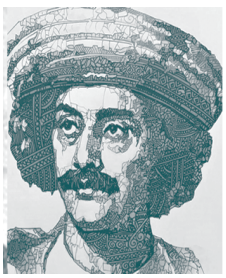

''সংপতি শ্রীরামপুরের মিশনারি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তিসিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছেন সে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় পাতাতে সম্পূর্ণ ছাপানো গেল। পরে পরে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তরকে এইরূপ ছাপানো যাইবেক।''

রামমোহন ও পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারে যে সকল দূরদর্শী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেখানেও হিন্দু শাস্ত্রের বচনকেই তাঁরা হাতিয়ার করেছিলেন। তাঁদের দেখানো পথ ধরেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙ্গালি আদর্শগতভাবে হিন্দুত্বের রসদ সংগ্রহ করেছিল, ১৭৭৩ সালে সংঘটিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত ১৮৮২ সালে প্রকাশিত ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাস এবং তারও আগে রচিত সেই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত বন্দেমাতরম্ সংগীত থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত উপন্যাসসমূহ যেমন দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম ও রাজসিংহ ইত্যাদি; তাঁর রচিত প্রবন্ধাদি যেমন 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণ চরিত্র', 'ধর্ম ও সাহিত্য', বিশেষত 'ভারতকলঙ্ক' (১৮৭২) প্রবন্ধে হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণ ও হিন্দু জাতীয়তা স্থাপন, হিন্দুত্বের অন্যান্য দিক যেমন গোহত্যা বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে তা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালির বৈঠকখানায় প্রবেশ করেছিল। হিন্দুর হিন্দুয়ানিটুকু বজায় থাক, এই উদ্দেশ্যে নিয়েই 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানধর্মের অন্যতম নেতা ভবানন্দের মুখে শোনা যায়, ''এই নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানি থাকে?'' (প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ)। সত্যানন্দের প্রত্যুত্তর, ''আমরা রাজা চাই না— কেবলমাত্র মুসলমানরা ভগবান বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশ নিপাত করিতে চাই।'' দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। এইভাবে বাঙ্গালির ঘরে ঘরে হিন্দুত্বের বীজ বপনের কাজটি করে দিয়েছিলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে এমনও কথা শোনা যায়, ''ভাই এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?'' ভারতে জাতীয়তাই যে হিন্দুত্বের রূপ তা স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন, ''আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু... লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতে আমার মঙ্গল।... অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয়, করিব। ... পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিত হয়, তাহাও করিব।''

তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যেই হিন্দুত্বের এমন নিদর্শন থাকলেও হিন্দুধর্ম নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখা যায়, ইংরেজিতে রচিত 'হিন্দুধর্ম' নামক পুস্তিকায় এবং বাংলায় রচিত 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' নামক রচনায়। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই বলেছেন—

''যে সমাজ ধর্মশূন্য, তাহার উন্নতি দূরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর তাঁহারা যদি বলেন যে, হিন্দুধর্মের পরিবর্তে ধর্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, কোন ধর্মকে আশ্রয় করিতে হইবে? পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম ও খৃস্টধর্ম, এই তিন ধর্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে; কেহই হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ইসলাম কতকগুলা বন্যজাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলা অনার্য্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃতি আর্য্যসমাজের কোনো অংশে বিচলিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় আর্য্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে।''

হিন্দুত্ববাদের প্রবক্তা হিসেবে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের

নাম উচ্চারিত হলেও ইদানীংকালের ইতিহাসবিদদের সৌজন্যে আমাদের জানা, সাভারকরের 'হিন্দুত্ব' শব্দটি ব্যবহারের অন্তত তিন দশক আগেই এক বাঙ্গালি ঔপন্যাসিক ও চিন্তাবিদ ১৮৯২ সালে হিন্দুত্বের উপর বই লিখে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম চন্দ্রনাথ বসু। তাঁর বইয়ের শিরোনামও 'হিন্দুত্ব'। ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে, চন্দ্রনাথ বসুর এই বই-ই হিন্দুত্বের আদর্শগত বিচারধারাকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালের এই আদর্শের প্রেরণাতেই তাঁর হিন্দুত্বের আদর্শগত রূপ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, হিন্দুত্বের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করার ক্ষেত্রেও এই বঙ্গপ্রদেশই ভারতকে পথ দেখিয়েছিল। ১৯০৬ সালে, সাভারকর একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেন হিন্দুদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য, যার নাম হিন্দু মহাসভা। এ ব্যাপারেও কিন্তু পথপ্রদর্শক এক বাঙ্গালি, তাঁর নাম

রাজনারায়ণ বসু। যিনি সম্পর্কে ঋষি অরবিন্দের মাতামহ এবং জাতীয়তামুখী নানান কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি 'ভারতীয় জাতীয়তার পিতামহ'-র আখ্যায় ভূষিত। ১৮৮৬ সালে তিনি 'ওল্ড হিন্দুস হোপ' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন, বাংলায় যার তর্জমাও হয় 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'। এতে তিনি হিন্দুদের জন্য একটি মহাসমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তা তখনই বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়িত না হলেও পরে তাঁর সেই স্বপ্নই চূড়ান্ত আকার ধারণ করে হিন্দু মহাসভা গঠনের মাধ্যমে। এই রচনাটি তাঁর পরিণত বয়সের। বলাবাহুল্য, পরিণত বয়সে তাঁর এই উপলব্ধি এসেছিল, যৌবনে হিন্দুত্বের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। মেদিনীপুরে তিনি যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা স্থাপন করেছিলেন, যার অনুপ্রেরণায় এক বীর বাঙ্গালি নবগোপাল মিত্র প্রথমে চৈত্র মেলা, পরবর্তীকালে 'হিন্দু মেলা' নামে একটি মেলার সূচনা করেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে সেই প্রথম হিন্দুত্বের সার্থক উদ্‌যাপন হয়েছিল, যা মাতিয়ে দিয়েছিল কলকাতা তো বটেই, মফস্‌সলের বাঙ্গালিদেরও। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল সোসাইটির এক অনুষ্ঠানে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শিরোনামে একটি বক্তৃতায় আসর মাত করে দেন। তাঁর বক্তৃতা শুনতে সেদিন উপচে পড়েছিল বাঙ্গালির ভিড়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের পাশাপাশি সমকালীন আরও এক বিশিষ্ট বাঙ্গালি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনেক রচনায় বিশেষ করে তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস'-এ হিন্দুত্বের আদর্শেরই জয়গাথা রচনা করেছিলেন। সেই সময়ই বিতর্ক সত্ত্বেও আরেকজন বাঙ্গালি তাত্ত্বিক শশধর তর্কচূড়ামণিও বাঙ্গালির মধ্যে হিন্দুত্বের আদর্শকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

তবে এই হিন্দুত্বের নবজাগরণের সময়সীমায় হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষতা যিনি প্রদর্শন করেছিলেন তিনি সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্ম মহাসভায় শুধু যে হিন্দুধর্মের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন তাই নয়, ১৮৯৭ সালের গোড়ায় ভারতভূমিতে পদার্পণ করে কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত বিভিন্ন অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে যা বলেন তাতে হিন্দুত্বের আদর্শের গৌরবগাথাই নিহিত আছে। যেমন ভারতের মাটি ছুঁয়ে কলম্বোয় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, ''পূর্বে সকল হিন্দুর মতো আমিও বিশ্বাস করিতাম— ভারত পুণ্যভূমি— কর্মভূমি।... আজ আমাদের এই সভায় দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি— ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য।" চিকাগো-বিজয়ের সংবাদে উচ্ছ্বসিত মাদ্রাজের জনগণের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি লিখেছিলেন, ''... যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর হিন্দুজাতির ঈশ্বরভক্তি ও সর্বভূতহিতৈষণারূপ অপূর্ব কীর্তিস্তম্ভ স্থাপিত, তাহা পূর্ববৎ অটুট ও অবিচলিতভাবে বর্তমান।" ভারতবাসীর প্রতি স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ দান রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন, যা হিন্দুত্বের মোড়কেই আবৃত। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সদ্যোজাতের পরিচর্যাতেই মাতৃত্বের পূর্ণতা

ঈশানী সেনগুপ্ত

'মা' পথিবীর সবচেয়ে সুন্দর একটি শব্দ। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, মা-ই হয়ে উঠে তার পৃথিবী। আর শিশু হয়ে ওঠে, মায়ের পৃথিবী। একটি শিশু জন্মানোর সঙ্গে, একটি মায়েরও জন্ম হয়। মা আর শিশু দুজনের জন্যই এ এক অদ্ভুত সময়। শিশু জানে না মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে কীভাবে বাঁচতে হয়। আর মাও জানে না শিশুকে নিয়ে কী করে বাঁচতে হয়। শিশুর বিভিন্ন রকমের কান্না, তাঁর বিভিন্ন স্বভাব, মায়েরও বুঝতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যায়। আর এই সময়টাই হয়ে উঠে বড়ো কঠিন। এখনকার দিনে ভারতবর্ষে প্রায় ৫০ শতাংশ শিশুর জন্ম সিজারের সাহায্যে হয়ে থাকে। এরকম সময় মায়ের শরীরে যখন ভালো খাদ্য ও পর্যাপ্ত ঘুমের প্রয়োজন, তখনই মায়েরা নিজেদের শরীরের কষ্ট উপেক্ষা করে তার সন্তানের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করেন। রাতের পর রাত জেগে থাকে যাতে তার কোলে সন্তান নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে।

বেশিরভাগ পরিবারেই গর্ভবতী মায়েদের খাওয়া দাওয়া ও সুস্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু শিশুর জন্মের পর, শিশুর দিকেই, পরিবারের সকলের মন চলে যায়। এরকম সময় নতুন মায়েরা অবহেলিত বোধ করতে থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে, যে হরমোনাল প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য এক গর্ভবতী মায়ের ঘন ঘন মুড সুইং ঘটে সেই একই হরমোনাল ক্রিয়াকলাপ কিন্তু এক সদ্যোজাত শিশুর মায়েরও হতে থাকে। আর এর থেকেই জন্ম নেয় প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা বা পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশন। নানা শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া বিক্রিয়া এবং পরিবেশ-পরিস্থিতিগত প্রভাবের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় মায়েদের মানসিক অনুভূতির ওঠাপড়া এবং মায়ের মনোজগতে ওঠা ঢেউয়ের কারণে তাদের ঘন ঘন মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন, স্বভাব, মেজাজ ও চরিত্রগত অবস্থান্তর এই সময় পরিলক্ষিত হয়।

ছোটোবেলায় নিজের মাকে অনেকবার বলতে শুনেছি 'মা হওয়া নয় মুখের কথা'। এখন এই কথাটার সারমর্ম নিজের জীবন দিয়ে বুঝতে পারি। যখন রাতে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য নিশ্চিন্ত ঘুম ঘুমায়, মায়েরা শিশুর কান্নার অ্যালার্ম ক্লকে জেগে যায়। রাতের বেলা যখন শিশু ভয় পেয়ে জেগে গিয়ে কাঁদতে থাকে, মা নিজের ঘুম ভুলে বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে তাকে শান্ত করে। শুধু রাত নয় সারাদিন ধরেও বাচ্চার নাওয়া-খাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ঘুমের দিকে লক্ষ্য রাখাটা মায়েদেরই প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে আমাদের সমাজ। আর সেরকমটাই শেখানো হয় মায়েদেরও।

আমি কখনোই এটা বলছি না যে সন্তানকে জন্ম দিয়ে মায়েরা সব সময় অবসাদে ভোগে। ন'টা মাস ধরে গর্ভে বেড়ে ওঠা এই ছোট্ট মানুষটাকে নিজের চোখের সামনে দেখতে পাওয়াটাই এক অভূতপূর্ব আনন্দ। বাচ্চাকে বুকে টেনে মা ও শিশু দুজনেই কিন্তু শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যখন সদ্য মা হওয়া মেয়েটি অনুভব করে যে সেই ছোট্ট প্রাণটা তার ওপরে পুরোটাই নির্ভরশীল তখন তার নিজের শরীরের ব্যথা ভুলে যাওয়া তার কাছে আর কঠিন হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে কি যে সেই মেয়েটা সদ্য প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করে এসেছে? যার শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে? যে নিজেই শারীরিকভাবে দুর্বল? ছোট্ট শিশুটি তো নিজের অসুবিধাগুলো বলতে পারে না, তার দু-তিন ঘণ্টা ছাড়া ছাড়া খিদে পায়, ঘুমানোর জন্য মায়ের কোল দরকার এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাতে জেগে থাকে।

এর ওপর থাকে পরিবার পরিজনদের সময় অসময়ে আনাগোনা ও ভালো-মন্দ পরামর্শ। এইসবের মধ্যে সদ্য মা হওয়া মেয়েটি বুঝতে পারে না সে তার সন্তানের ঠিকমতো পরিচর্যা করতে পারছে কিনা, আর সন্তানের সব রকম চাহিদা সে মেটাতে পারছে কিনা। সে নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে থাকে। আর এমতাবস্থায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়াটা স্বাভাবিক।

গৃহবধূ হোক বা চাকুরিরতা, শিশুর জন্মের পর দু থেকে তিন মাস মায়েরা একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করেন। এই সময় তার পরিবারের এবং বিশেষ করে তার স্বামীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়া মেয়েটির যদি খেয়াল রাখা যায়, সে যাতে সুস্বাস্থ্যকর খাবার ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায়, সেই দিকে খেয়াল রাখা যায়, তবে দেখা যাবে যে মেয়েটি বেশ সুস্থভাবেই তার সন্তানকে আলিঙ্গন করে বাঁচতে শিখে গেছে। তার সন্তানের ফুটফুটে হাসির দিকে তাকিয়ে সদ্য মা হওয়া মেয়েটি নিজের সব যন্ত্রণাই ভুলে গিয়ে তার মাতৃত্বকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। বেশি কিছু না। দরকার একটু সময়, সাহায্য ও সহযোগিতার-যাতে মা হয়ে ওঠাটা কোনো মেয়ের কাছে কঠিন না হয়ে দাঁড়ায়। □

নবজাগরণের ভোরের পাখি রাজা রামমোহন রায়

রাজদীপ মিশ্র

উনিশ শতকে ভারতবর্ষের নবজাগরণের পথ যে কয়েকজন মনীষীর দ্বারা উন্মোচিত হয়েছিল, রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তাঁদের পুরোধা। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের সমাজ সংস্কারের অন্যতম পথিকৃৎ। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ভারত পথিক' নামে অভিহিত করেন। মোগল বাদশা দ্বিতীয় আকবর তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়কে 'আধুনিক ভারতের জনক' বা ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বলা হয়।

তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমাদের সমাজ সংস্কার এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁর মধ্যে ছিল অদ্ভুত চারটি গুণ— যুক্তিশীলতা, সর্বজনীনতা, সহনশীলতা ও সমন্বয়ের ক্ষমতা। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কলকাতায় এত খ্যাতি লাভ করেন, তার পেছনে প্রধান কারণ ছিল হিন্দুধর্মের কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা। তিনি ১৮১৫ সালে আত্মীয় সভা স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্ম ও সমাজের সংস্কারপন্থী ব্যক্তিদের একত্রিত করে আলোচনা করা। জাতিভেদ প্রথার ত্রুটি, সতীদাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার সমালোচনা এই সভায় হতো।

তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মন তাঁকে শিখিয়েছিল— যে কোনো প্রচলিত সামাজিক নিয়মকে যুক্তির নিরিখে যাচাই না করে কখনও তা গ্রহণ করা উচিত নয়। তৎকালীন হিন্দু সমাজে হিন্দু বিধবাদের স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারার যে বিধান ছিল তা দূর করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রবল জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন তিনি। তিনি বুঝেছিলেন যে, শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সতীদাহের প্রতিবাদ না করলে লোকে তা গ্রাহ্য করবে না। এজন্য ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। ৩০০ ব্যক্তির সংবলিত একটি আবেদন দ্বারা সরকারকে সতীদাহ নিষিদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন। উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭নং রেগুলেশন দ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন। শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি, বহুবিবাহ ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ জানান। স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবাদের অধিকারদানকে সমর্থন করে তিনি পুস্তিকা রচনা করেন এবং এ সম্পর্কে হিন্দুশাস্ত্র থেকে ব্যাখ্যা দেন। পুরুষের বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও গর্জে ওঠে তাঁর লেখনী।

রামমোহন রায় একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেদান্ত সূত্র এবং তার সমর্থক উপনিষদগুলি বাংলায় অনুবাদ করে তিনি প্রচার করতে থাকেন। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষদ ও মুণ্ডকোপনিষদ।

শ্রীরামপুরের মিশনারিদের হাত থেকে হিন্দু একেশ্বরতত্ত্ব ও বেদান্তকে বাঁচাবার জন্য রামমোহন দুটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন— বাংলায় 'ব্রাহ্মণসেবধি' এবং ইংরেজিতে 'Brahminical Magazine'।

'ব্রাহ্মণসেবধি' পত্রিকায় রামমোহন রায় ভারতীয় উপমহাদেশে শাসন ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে ইংরেজদের দ্বারা ভারতীয়দের ধর্মান্তরণের বিরোধিতা করেছিলেন। কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের অমিত দাশ রামমোহন রায়ের কর্মজীবন নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করেছেন। ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনের উদ্ধৃতি

দিয়ে তিনি একজায়গায় লিখছেন--- 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনে রামমোহন রায় লিখেছিলেন : 'বাংলাদেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নামে লোকে ভীত হয়, তথায় এরূপ দুর্বল, দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর এবং তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করাটা কী ধর্মত, কী লোকত প্রশংসনীয় হয় না।'

ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশনার প্রাথমিক পর্বে রামমোহন ছিলেন একজন প্রধান কাণ্ডারি। তিনি জানতেন জনমত গড়ে তোলার জন্য মুদ্রণযন্ত্র ও পত্রপত্রিকার গুরুত্ব অনেক। আগে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকে তাঁর পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হতো। কিন্তু যখন রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ বাধে তখন থেকে তাঁরা রামমোহনের পুস্তিকা ছাপতে অস্বীকার করে। এতে তাঁর জেদ আরও বেড়ে যায়। তিনি নিজেই ধর্মতলায় গড়ে তোলেন নিজস্ব ইউনিটেরিয়ান প্রেস। সেখান থেকেই বের হতো তাঁর নিজের কাগজ 'সম্বাদ কৌমুদী'। হিন্দুধর্মের নিন্দা এবং খ্রিস্টান মতে গুণগান করার জন্য মিশনারিরা যেমন একাধিক পত্র পত্রিকা বের করতেন; রামমোহনও নিজের মতকে অনেক জোরের সঙ্গে এইভাবেই ছড়িয়ে দিতেন। নিজের মত প্রকাশ করে ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনের চতুর্থ সংখ্যায় তিনি লিখলেন--- 'সার্বজনীন সহিষ্ণুতার মনোভাব হিন্দুধর্মের একটি মূলগত নীতি; সেই মনোভাব নিয়েই আমি কোনো ধর্মমতের বিরোধিতা করতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু হিন্দুধর্মের উপর খ্রিস্টান লেখকদের নির্বোধ আক্রমণের ফলেই আমায় একাজ করতে হয়।'

একের পর এক আলোচনা সভায় খ্রিস্টান মিশনারিরা মূল বাইবেল না পড়ার কারণে খ্রিস্টমত নিয়ে রামমোহনের আলোচনার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রামমোহন অত্যন্ত নম্রভাবে সেই সমালোচনার যথার্থ্য স্বীকার করে ল্যাটিন, গ্রিক আর হিব্রু পড়তে লাগলেন এবং দু' বছর আর মিশনারিদের সঙ্গেও আলোচনায় ভাষা অধ্যয়ন করতে অবতীর্ণ হলেন না। তাঁর নিজের বক্তব্য থেকে জানা যায়— 'এই কারণে দু' বছর পর আমি ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশ করেছি।'

জাতীয়তাবাদী, হিন্দুত্ববাদী এবং নবজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে রামমোহন সম্পর্কে এরকম বহু ঘটনা আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে পাদরিরা খ্রিস্টমত প্রচার করার জন্য বেশ সচেষ্ট হয়েছিল। একথা মনে রাখতে হবে যে, হিন্দুধর্মকে যে সকল বিশ্বাস ও মতামতের অন্ধতা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল--- সেগুলি সম্পর্কেও রামমোহনের সমালোচনা তীব্র ছিল। একবার এক পাদরিকে রামমোহন উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। পাদরিরা এদেশের মানুষকে পতিত বলে মনে করত। কেউ-বা ভারতবর্ষকে ভূত-প্রেতের দেশ মনে করত এবং খ্রিস্টমতে দীক্ষা দিয়ে তাদের উদ্ধারের তথা পরিত্রাণের কথা ভাবত। কিন্তু ভারতবাসীরা তা মানবে কেন? অনেকেই পাদরিদের ধারে-কাছেও যেতে চাইত না। পাদরিরা ভাবল— 'যদি কিছু বড়ো বড়ো মানুষকে খ্রিস্টমতে দীক্ষা দেওয়া যায় তবে ভারতের অনেকেই ধীরে ধীরে খ্রিস্টান হয়ে যাবে'।

পাদরিরা এও বুঝেছিল, ভালো কথায় সকলকে রাজি করানো যাবে না। বড়ো চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে, ঠুনকো সম্মান দিয়ে তারা বড়ো লোকদের কাছে টানবার চেষ্টা করল। তাদের লক্ষ্য ছিল রামমোহনের দিকে। রামমোহন ইংরেজদের সঙ্গে মিশতেন, খ্রিস্টানদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। পাদরি মিডলটন সাহেবের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর বাড়ি যেতেন এবং সেখানে ধর্মালোচনায় অংশ নিয়ে হিন্দুধর্মের কুপ্রথা, দোষ-ত্রুটিগুলি তুলে ধরতেন। এই সুযোগে একদিন মিডলটন সাহেব রামমোহনকে ধর্মান্তরের টোপ দিলেন। বললেন, আপনি নিজেই যখন হিন্দুধর্মের এত সমালোচনা করছেন, তখন আপনি খ্রিস্টমত গ্রহণ করছেন না কেন? খ্রিস্টান হলেই আপনার টাকা পয়সা হবে, বড়ো বড়ো ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোনো বড়ো পদ পাবেন, মান-সম্মান সব পাবেন! গর্জে উঠলেন রামমোহন। বললেন, আমার ধর্মে যা কিছু খারাপ দিক আছে, তা আমি আমার ধর্মে থেকে সংশোধন করব, ধর্মান্তরণ করব না। মিডলটনের বাড়ি থেকে তিনি ঘৃণায় বেরিয়ে এলেন। আর কোনোদিন সে বাড়িতে যাননি।

রামমোহন তাঁর সমকালীন হিন্দু সমাজের সংস্কার করতে গিয়ে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদকে হিন্দুধর্মের মূল আধার বলে স্বীকার করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দুধর্মের প্রতিস্পর্ধী কোনও স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলতে চাননি। ১৭৭২ সালের ২২ মে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ব্রিটেনের ব্রিস্টলে ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। উনবিংশ শতকে রামমোহন যে মুক্ত চিন্তা-চেতনার আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই আলোতে ভারতের নবজাগরণের পথটি ত্বরান্বিত হয়েছিল।

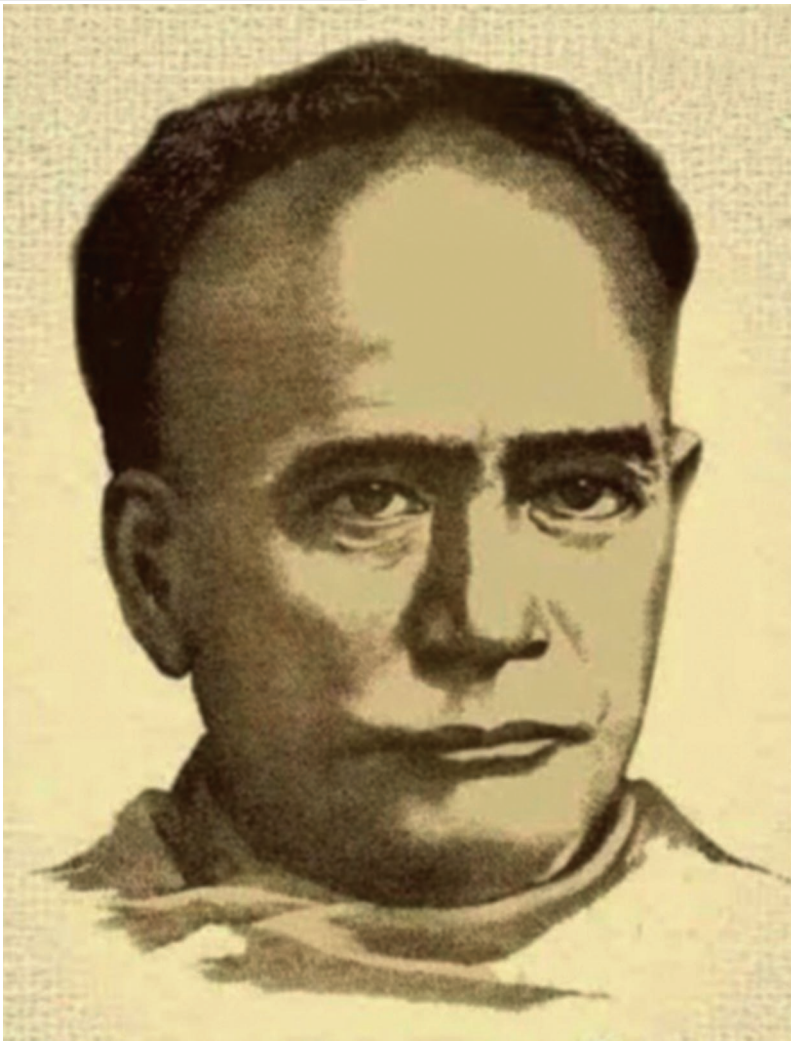

সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রই ছিল শস্ত্র

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

হিমালয়, গঙ্গা, গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র বিধৌত ভারত ভূমিতে রয়েছে গভীর এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি। তাই মিশর, সিরিয়া, পারস্য বা পৃথিবীর নানা প্রান্তের অজস্র দেশ তাদের প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করে উপাসনা পদ্ধতির পরিবর্তন করলেও এদেশ তার ধর্ম ভাবনাকে ত্যাগ করেনি। শাস্ত্র ও হিন্দুত্ববোধ তার অস্থি-মজ্জায় সক্রিয় বলে তাকে অবনত করা সম্ভব হয়নি। এই সারসত্য বুঝেছিলেন উনিশ শতকের বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর কথায় 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রিত করিয়া রচনা লিখিতে হইলে তাহা ধর্মাশ্রিত হইতে হইবে।'

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের জন্য হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রকেই অস্ত্র করলেন। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ছিল না তাঁর লড়াই। আবেগের সঙ্গে পৌরুষ যাঁর স্বভাবগত, সেই বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের জন্য শস্ত্র হিসেবে শাস্ত্রকেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রবিরোধী হননি। ধর্ম তাঁর কাছে ছিল সামাজিক মঙ্গলের এক পথ। তাই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সমসাময়িক কিছু উন্মার্গগামীদের মতো বিদ্যাসাগর পরিচালিত হননি। তিনি জানতেন ধর্মের ভিত্তির উপর নির্ভর করে সামাজিক সংস্কার করলে তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

বিদ্যাসাগর নিজে বলেছেন, 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।' বিদ্যাসাগরের আগেও বিধবাবিবাহের উদ্যোগ চোখে পড়ে। ১৮৫৬-তে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হওয়ার একশো বছর আগে ঢাকার নায়েব রাজবল্লভ নিজের অকাল বিধবা ছোটো মেয়ের বিয়ের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তিনজন দ্বার পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, নীলকণ্ঠ সার্বভৌম এবং কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের সাহায্য চান। পণ্ডিতত্রয়ী জানিয়েছিলেন যে, অক্ষতযোনি বিধবাদের বিয়েতে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ নেই। কাশী, কাঞ্চী, মিথিলার পণ্ডিতেরাও একই মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু রক্ষণশীল নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজ ও তাঁদের শিরোভূষণ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিরোধিতা করায় সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি। শতবর্ষ পর বিদ্যাসাগরের সাফল্যের কারণ কী? বিদ্যাসাগর নিজেই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ফলে শাস্ত্র তাঁর বিপুলভাবে অধীত। তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কার্যকলাপে সেই সময় হয়ে উঠেছিলেন এক সচল প্রতিষ্ঠান। শতবর্ষ পরে সময় কিছুটা হলেও অগ্রবর্তী। আর ইতিপূর্বে রামমোহন রায় যে সমস্ত সদর্থক পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন তার ফলেও সমাজ ভাবনায় আলোড়ন আসে। বিদ্যাসাগর গভীরভাবে ছিলেন বাস্তববাদী। মোহহীন সমাজ পর্যবেক্ষক। তিনি হিন্দু শাস্ত্রকেই আশ্রয় করেছিলেন বিধবাবিবাহের জন্য। পরাশর সংহিতা কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র বলে তিনি তাকে গ্রহণ করলেন। মনু প্রভৃতির শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে পতি বিয়োগের পর বিধবার তিনটি পথ রয়েছে, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য, সহগমন। অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ একেবারেই শাস্ত্র সম্মত। প্রমাণ হিসেবে শাস্ত্র বচনকেই যুদ্ধজয়ের শস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন—

'মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহনং বা।
শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতিধৃত বিষ্ণুবচন।।'

পরাশর চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন স্বামী গৃহত্যাগী হলে, নিরুদ্দিষ্ট হলে, মারা গেলে, ক্লীব বলে ধার্য হলে বা পতিত হলে স্ত্রীর বিবাহ শাস্ত্র সম্মত—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।'

পরাশর অন্য দুটি বিধিরও নির্দেশ

দিয়েছিলেন— ব্রহ্মচর্য ও সহগমন। বিদ্যাসাগর এরপর অসাধারণ যুক্তি প্রয়োগ করেন 'তন্মধ্যে রাজকীয় আদেশক্রমে, সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে।' আবার নারীর একান্ত যে সমস্যা তা কোমল হৃদয়ের বীরসিংহের সিংহ উপলব্ধি করেছিলেন। কেন বিধবা বিবাহ প্রয়োজন সে সম্পর্কে সমাজ দার্শনিক ও পর্যবেক্ষকের মতো সিদ্ধান্ত শোনা গেল—

'কলিযুগে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্রা নির্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই লোকহিতৈষী ভগবান পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন।'

পরাশর জানিয়েছেন বিধবার গর্ভে জন্ম নেয় তিন প্রকার পুত্র— ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম। বিদ্যাসাগর পরাশরের সাহায্য নিয়েই ঘোষণা করলেন যে, বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র মুখ্য পুত্র। আবার পরাশর মুনির দ্বারস্থ হয়ে এই পণ্ডিতপ্রবর তাঁর মতের দৃঢ়তা প্রকাশ করেন—

'স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্ত স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীযাৎ পুত্রং প্রথমকল্পিকম্।।'

বিপুল অধ্যয়ন ও শাস্ত্রীয় যুক্তির শরজালে তিনি ভিন্ন মতাদর্শীদের ছিন্নভিন্ন করেন। বিধবাবিবাহ যে একই সঙ্গে শাস্ত্রীয় ও শিষ্টাচার সম্মত তা সগৌরবে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বশিষ্ঠ সংহিতার উদ্ধৃতি দিলেন। বিদ্বান এই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবাক্যের পবিত্রতা স্মরণ করিয়ে জানালেন যে লৌকিক বা পারলৌকিক শাস্ত্রবিষয়ক ধর্ম আশ্রিত। শাস্ত্রের বিধান থাকলে শিষ্টাচার প্রমাণ—

'লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে
শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্।।'

তিনি বিদ্যাসাগর। যুক্তির পারম্পর্য ও ন্যায়ের ক্রম সমন্বয় তাঁর সিদ্ধান্তের সূত্র। শাস্ত্রনির্ভর জাতকে স্বমতে আনতে শাস্ত্রবাক্যই প্রয়োজনীয়। পরাশর মুনির উদ্ধৃতি দিয়ে বিধবার গর্ভজাত সন্তানকে বৈধ বলে তাই ঘোষণা করেন অক্লেশে— 'অতএব যখন পরাশর কলিযুগে বিধবার বিবাহের বিধি দিয়াছেন এবং দ্বাদশ প্রকারের মধ্যে কেবল তিন প্রকারের পুত্রের বিধান করিয়াছেন এবং যখন বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র দত্তক ও কৃত্রিম লক্ষণ ঘটিতেছে না, কিন্তু ঔরসে পুত্রের লক্ষণ সম্পূর্ণ ঘটিতেছে, তখন তাহাকে অবশ্যই ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।'

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তিকা দ্রুত কয়েক হাজার কপি শেষ হয়। বিরুদ্ধবাদীরা নানা প্রসঙ্গ তুলে তাঁর বিরোধিতা করলে তিনি নারদ সংহিতার দ্বারস্থ হলেন। বিরোধীরা শেষপর্যন্ত দেশাচারের প্রসঙ্গ তুললে বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুশাসন পর্ব থেকে নানা শ্লোক উল্লেখ করে সপ্রমাণ করেছেন বেদে অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি বা নিষেধ না থাকলে দেশাচার বা কুলাচার দেখে ধর্ম নিরূপণ করতে হয়। বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় নির্দেশ বর্তমান থাকায় দেশাচার অপ্রয়োজনীয়। বিদ্যাসাগরের 'রত্নপরীক্ষা' মধুসূদন স্মৃতিরত্নের বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ পুস্তিকার উত্তর। ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ও প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন ছিলেন মধুসূদন স্মৃতিরত্নের পরামর্শদাতা। এই রত্নত্রয়ীর বিরুদ্ধে মত-প্রতিষ্ঠা হলো 'রত্নপরীক্ষা'। অপরিসীম পাণ্ডিত্য, অসাধারণ মেধা ও নৈয়ায়িক যুক্তির সঙ্গে বিদ্যাসাগর বৈদিকঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোক ব্যবহার করেন। স্মার্ত রঘুনন্দনের টীকাও তিনি উল্লেখ করলেন—

ক্ষতযোগ্যা অপি সংস্কারমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।
অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভঃ সংস্কৃত পুনঃ।।

অক্ষত বা ক্ষত যোনিরও বিবাহ যে সিদ্ধ তা সপ্রমাণ করলেন। সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিধবাবিবাহ। তা স্বয়ং তাঁর স্বীকারোক্তি। কিন্তু যুগস্রষ্টা এই পুণ্যশ্লোক মহামানব আরও নানা সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে জড়িত। বাল্যবিবাহ রোধ তাঁর সাফল্যের আর এক দিক। আধুনিক দৃষ্টিতে তিনি বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণনা করেছেন। বাল্যবিবাহের জন্য 'আমোদ প্রমোদে' ও 'কেলিকৌতুকে' বিদ্যাশিক্ষা ব্যাহত হয়। উপার্জন ক্ষমতার আগেই সন্তানের পিতা হওয়ায় বিব্রত অবস্থার সৃষ্টি হয়। শাস্ত্রবিদ্যায় সাতিশয় পারদর্শী বিদ্যাসাগর আবার শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গের আশ্রয় নিয়ে বলেন—

'যদ্যপি তৎকালে অষ্টবিধ বিবাহক্রিয়ার শাস্ত্র পাওয়া যায়, তথাপি অধিবয়োনিষ্পন্ন গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস, পৈশাচ— এই সমুদায় প্রকার বিবাহক্রিয়া বরকন্যার অধিক বয়স ব্যতীত সম্ভবে না।'

বহুবিবাহ বৈদেশিক আক্রমণ ও অত্যাচারের সময়ে বহু প্রচলিত ছিল। বিদ্যাসাগর আধুনিক সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন বলেই কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহের বিরোধী ছিলেন। শাস্ত্র থেকে অজস্র উদ্ধৃতি এবং প্রতিপক্ষের যুক্তির অসারতা খণ্ডন করে তিনি বহুবিবাহ রোধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। মনু বচনের সাহায্যে তিনি স্বমতে তাঁর অবস্থানকে ব্যক্ত করলেন—

সর্বনাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মনি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরাঃ।।

তিনি এই শ্লোকের সাহায্যে ব্যক্ত করলেন যে পরিসংখ্যা বিধি দ্বারা পূর্ব পরিণীতা স্বজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, স্বজাতীয়া বিবাহ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে নানা যন্ত্রণাময় উদাহরণের পর বিদ্যাসাগর জানান '...বয়স্থা কুলীন মহিলা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করেন।' ভারতীয় মূল্যবোধ, শাস্ত্র নারীকে দেবীর মর্যাদা দেয়। তাই শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গের সাহায্যে উন্নত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মনে অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল দেশীয় ধর্ম ও ন্যায় শাস্ত্র। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শাস্ত্র সমুদ্রে অবগাহন করেছেন। তিনি জানেন প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল সমৃদ্ধ ও উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন। বৈদিক ঋষিরা নারীর অবস্থানে ছিলেন অতীব শ্রদ্ধেয়। যে সমাজে স্বয়ম্বর প্রচলিত, সেখানে নারীরা যে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। গার্গী, অপালা, ঘোষা, লোপামুদ্রা প্রমুখ নারীর দেশ পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের জন্যই বাল্যবিবাহ প্রচলিত হয়। মেয়েদেরও শিক্ষা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার করতে চেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও চাইতেন নারী শিক্ষার প্রসার। বস্তুত ভারতীয় দর্শন ও উন্নত মনন তাঁদের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পথ প্রশস্ত করেছে।

বস্তুত, সমাজ-দার্শনিক বিদ্যাসাগর শাস্ত্রকেই শস্ত্র করে সমাজ বিগর্হিত নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। রামমোহন রায় যেমন বেদ, উপনিষদকে অস্ত্র করে মিশনারিদের হিন্দুধর্ম বিরোধী প্রচারকে ব্যর্থ করেছেন। বিদ্যাসাগরও তেমনই বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ করে, নারীশিক্ষা প্রচলন ঘটিয়ে সমাজ জাগরণের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। একই সঙ্গে তাঁরা এদেশীয় ধর্ম, ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাই ভারতীয় শাস্ত্র থেকে প্রাসঙ্গিক অংশকে অবলম্বন করে সমাজ সংস্কারের কাজ করেছেন। বিদ্যাসাগরের পারিবারিক স্মার্ত পরিমণ্ডল, সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে অসামান্য দক্ষতা, বাস্তববোধ, সমুদ্র পরিমাণ সহৃদয়তা, নারী জাতির প্রতি এদেশীয় দেবীসুলভ মর্যাদাব্যঞ্জক মনোভাব তাঁর সমাজ সংস্কারের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। শাস্ত্রই শস্ত্র হয়ে এই মহামানবের সমাজ সংস্কারের বিজয় কাব্য রচিত হয়েছে। ■

শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনির সারদা শিশুতীর্থ সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ

পূর্ব ভারতে বিদ্যাভারতীর প্রথম বিদ্যালয় সারদা শিশুতীর্থ, সূর্যসেন কলোনি, শিলিগুড়ি গত ৫ সেপ্টেম্বরে পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করল। এই আবেগপূর্ণ, আনন্দঘন মুহূর্তটি চারদিন ব্যাপী (৫-৮ সেপ্টেম্বর) নানা কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

বিকেল ৪টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতার স্বামী বিদ্যানন্দজী মহারাজ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিখিলেশ রায়। তাঁদের মুখে শিক্ষা, ভারতীয় ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানা কথাবার্তায় উপস্থিত সকলে

গত ৫ সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৫০টি নির্বাচিত এলাকার মন্দির থেকে শিক্ষার্থীদের মায়েরা পবিত্র মঙ্গলবারি নিয়ে এলে তা দিয়ে অভিষেক করা হয় এবং ৫০টি শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি ও উলুধ্বনি সহযোগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী অতীশানন্দজী মহারাজের করকমলে পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক কথা এবং আশিসধন্য বাণী আগামীদিনে শিশুতীর্থের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

সমৃদ্ধ হন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রসার, ব্যক্তি বিশেষের সান্নিধ্যের ইতিহাস সকলের সামনে তুলে ধরেন বিদ্যালয়ের পূর্বতন প্রধান আচার্য এবং বর্তমানে বিদ্যালয়ের সভাপতি বিমল কৃষ্ণ দাস। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং বিদ্যাভারতীর কার্যকর্তারা।

গত ৬ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় 'প্রাক্তন বিদ্যার্থী মিলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সমাজের প্রতি একজন প্রাক্তন বিদ্যার্থীর দায়দায়িত্ব এবং শিক্ষা প্রসারে তার করণীয় কর্তব্যের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। বিকেল ৩টায় অভিভাবক সম্মেলনে বিদ্যাভারতীর পূর্বক্ষেত্র সম্পাদক দিবাকর ঘোষ অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে শিশুতীর্থের পঠনপাঠনের বিশেষত্ব, শিশুর বৌদ্ধিক, মানসিক তথা সার্বিক বিকাশ, চরিত্র গঠনের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক হওয়ার দিশা, মাতৃভাষায় পঠনপাঠনের গুরুত্ব, ভারতীয় ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আদর্শের পাশাপাশি বর্তমান শিক্ষানীতি (দ্য ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি - ২০২০) - সহ নানা বিষয়ে আলোকপাত করেন। এর সঙ্গে আগামীদিনে অভিভাবকদের সাহায্যে বিদ্যালয়ের তরফে বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়সূচিও প্রস্তাবিত হয়।

গত ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর, 'এ দেশ আমার' ভাবনায় আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও গীতি

আলেখ্যর মধ্য দিয়ে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিদেশি শক্তির জাল ছিন্ন করে স্বাধীনতার আবেগ, দেশের নারী শক্তির বীরদৃপ্ত চরিত্র--- মণিকর্ণিকা ও গৌড়লীলা প্রসঙ্গ উঠে আসে। শিলিগুড়ি সন্নিহিত বিদ্যালয়--- অলোকমিতা সারজা শিশুতীর্থ, সিপাইপাড়া; সারদা শিশুতীর্থ— ঘোগোমালী, রানিডাঙ্গা, পাথরঘাটা; এবং সারদা বিদ্যামন্দির— পুঁটিমারী, সেবক রোড, নকশালবাড়ি অংশগ্রহণ করে সারদা শিশুতীর্থ, সূর্য সেন কলোনির এই অনুষ্ঠানটিকে আরও বর্ণময় করে তোলে। ৭ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথির আসন অলংকৃত করেন জলপাইগুড়ি জেলার এডিআই অফ স্কুলস্ (প্রাঃ) রাজগঞ্জ, পশ্চিম সার্কেল— রাজীব চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভারতীর পূর্বতন কার্যকর্তা লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। শ্রীভালা এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষেও উপস্থিত ছিলেন। স্বর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সকলকে তিনি পথ প্রদর্শন করলেন। ৮ তারিখ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. ডালিয়া ভট্টাচার্য।

তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে শ্রম সাধনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এছাড়া অতিথির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন বিদ্যাভারতী, উত্তরবঙ্গের সম্পাদক দেবাশিস লালা।

উদ্বোধনী পর্বের অনুষ্ঠানগুলি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য অনিরুদ্ধ দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি লগ্নে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আগামী একবছর ব্যাপী নানা কার্যক্রমের জন্য সকলকে সহযোগী হিসেবে থাকার অনুরোধ জানান।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের মালদহ জেলার সাধারণ সভা

মালদহ জেলার গাজোলের কদুবাড়ী জয়মালা লজে গত ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হলো ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের মালদহ জেলার সাধারণ সভা। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি কল্যাণ কুমার মণ্ডল, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়, প্রান্ত মহিলা প্রমুখ ড. অলি ব্যানার্জি, বিভাগ সংগঠন সম্পাদক সুশীল চৌধুরী। কিষাণ সঙ্ঘের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর অনুপম গোস্বামীর নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে কিষাণ সঙ্ঘের ভাবসংগীত 'জনসেবা যে কর্ম

আমাদের' গানটি গাওয়া হয়। প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়। বক্তব্য রাখেন ড. অলি ব্যানার্জি, নিখিল চন্দ্র মজুমদার, রঞ্জিত কর্মকার, বিদায়ী জেলা সম্পাদক গুপ্তেশ্বর চৌধুরী, জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস। এরপর আগামী তিনবছরের জন্য জেলার নতুন সমিতি গঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রান্ত সভাপতি কল্যাণ কুমার মণ্ডল। নতুন সমিতিতে নির্বাচিত হলেন— সভাপতি- চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, সহসভাপতি- অমূল্য ঘোষ ও পরেশ চন্দ্র সরকার। সম্পাদক- পার্থ চক্রবর্তী, সহসম্পাদক- মনোরঞ্জন মণ্ডল ও পাঁচু রাজবংশী। কোষাধ্যক্ষ জয় প্রকাশ বিশ্বাস। যুবা প্রমুখ জয়জিৎ সরকার, মহিলা প্রমুখ- বন্দনা মণ্ডল, সহমহিলা প্রমুখ- অর্চনা সরকার ও সোনালী মুদি। জৈব সার প্রমুখ রঞ্জিত কর্মকার, প্রচার প্রমুখ গুরুদাস বিশ্বাস। এছাড়াও সদস্য হিসেবে এসেছেন প্রণব লাহিড়ী, প্রফুল্ল সরকার, বীরেন মণ্ডল, বীরেন ঘোষ। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনার পাশাপাশি একক সংগীত পরিবেশন করে সকলের মন জয় করেন পরেশ চন্দ্র সরকার। সভায় ১৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বিকালে গাজোলের রাজপথে শোভাযাত্রা বের হয় এবং শেষে গাজোল বিদ্রোহী মোড়ে পথসভা হয়। এই পথসভায় বক্তব্য রাখেন গুপ্তেশ্বর চৌধুরী, পরেশ চন্দ্র সরকার, ড. অলি ব্যানার্জি এবং কল্যাণ কুমার মণ্ডল।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার ১৩১ বছর পূর্তিতে বিবেক জাগরণ যাত্রা

গত ১১ সেপ্টেম্বর স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার দিনে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তরুণী ডাক্তার ছাত্রী 'তিলোত্তমা'-র মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নামলো প্রবুদ্ধ সমাজ। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সুস্থ চেতনা ও বিবেকবোধের সার্বিক জাগরণের লক্ষ্যে শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-সহ সমাজের সব স্তরের বিদ্বজ্জনেরা এদিন বিকেল সাড়ে ৪টার সময় স্বামীজীর পৈতৃক বাসভবনের সামনে মিলিত হন। সেখান থেকেই তাঁরা শুরু করেন 'বিবেক জাগরণ যাত্রা'। তাঁদের পথ চলা শুরু হতেই এই প্রতিবাদী পদযাত্রায় যোগ দেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। পদযাত্রার নেতৃত্বে ছিলেন স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ সুকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কুণাল সরকার, প্রবাদপ্রতিম শিল্পী মিঠুন চক্রবর্তী, প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক ও সাংসদ ড. বিক্রম সরকার প্রমুখ। তিলোত্তমার হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার এবং এই ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতেপদযাত্রা থেকে মুহুর্মুহু স্লোগান ওঠে। প্রতিবাদমুখর, বিবেকবান মানুষদের অংশগ্রহণে সংঘটিত এই বিবেক জাগরণ যাত্রা শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তির পাদদেশে শেষ হয়।

উত্তরবঙ্গ সামাজিক সমরসতার বর্ধিত টোলি বৈঠক

গত ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের 'সামাজিক সমরসতা অভিযান'-এর বর্ধিত টোলি বৈঠক। সকাল ১১টায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে বৈঠক শুরু করেন কলকাতা ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা অভিযান প্রমুখ গৌতম কুমার সরকার। নবনিযুক্ত প্রান্ত সমরসতা প্রমুখ গৌরাঙ্গ তলাপাত্র সকলের পরিচয় করিয়ে দেন। বিদায়ী প্রমুখ কমল রায় তাঁর দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা সকলের সামনে তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় বৈঠকের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে মত বিনিময় এবং আগামীদিনের কাজ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠক টোলির সদস্য স্বামী মঙ্গলানন্দ তাঁর বক্তব্য রাখেন। এরপর টোলির সদস্যদের সামনে আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন ক্ষেত্রপ্রমুখ গৌতম কুমার সরকার। বৈঠক শেষে সহভোজ সম্পন্ন হয়। ওখানেই বিকেল ৪টায় নগর সমরসতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন গৌরাঙ্গ তলাপাত্র ও গৌতম কুমার সরকার। প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রীমতী সুপনা দেবী রাম প্রধান সন্ত রবিদাসজীর উপরে ভাষণ দেন। এই সম্মেলনে সমতার ভাবে পরিপূর্ণ সমাজ নির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করা হয়। সম্মেলন শেষে জেলা সভাপতি শ্রী মোদক সকলকে ধন্যবাদ জানান।

তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, মাতৃশক্তি ও দুর্গাবাহিনীর ডাকে বিক্ষোভ পদযাত্রা

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মা-বোনেদের ওপর সম্প্রতি যে হারে অত্যাচার ও নৃশংসতা বেড়ে চলেছে তাতে এই রাজ্যে মহিলারা যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত নয় তা আজ দিনের আলোর মতোই

পরিষ্কার। গত ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দুর্গাবাহিনী ও মাতৃশক্তির ডাকে পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনেদের ওপরে হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে নিহত ডাক্তার ছাত্রী তিলোত্তমার বীভৎস হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে কলকাতার রাজপথে একটি বিক্ষোভ পদযাত্রা আয়োজিত হয়। পদযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সার্বিক জনজাগরণ। এই প্রতিবাদী পদযাত্রাটি এদিন শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড় থেকে শুরু হয়। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মধ্য কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যারে পৌঁছে পদযাত্রাটি শেষ হয়। আগামী প্রজন্মের নারীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা, মাতৃশক্তি, দুর্গাবাহিনীর কার্যকর্ত্রী-সহ অসংখ্য মা-বোনে। পদযাত্রাটির নেতৃত্বে ছিলেন দুর্গাবাহিনী, পশ্চিমবঙ্গের সংযোজিকা ঋতু সিংহ, দুর্গাবাহিনী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজিকা পারমিতা পাল, মাতৃশক্তি, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজিকা বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক মানিক চন্দ্র পাল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস।

পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারী দুর্গারা পশ্চিমবঙ্গের বুকে ঘটে চলা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হন। আগামীদিনেও তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে তাঁরা জোরালো কণ্ঠে জানান। পদযাত্রা থেকে মুহুর্মুহু স্লোগান ওঠে--- 'দুর্গাবাহিনী দিচ্ছে ডাক, তিলোত্তমা বিচার পাক'।

জয়রামবাটীর মা সারদা শিশু বিদ্যামন্দিরে কলেজ ছাত্র সম্মেলন

গত ৭ সেপ্টেম্বর তারকেশ্বর সাংগঠনিক জেলার কামারপুকুর খণ্ডের জয়রামবাটীর মা সারদা শিশু বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো কলেজ ছাত্রদের একটি মনোগ্রাহী সম্মেলন। ছাত্রদের দ্বারা দেশাত্মবোধক গান, সংস্কৃত শ্লোক, স্বামীজীর বাণী এবং ছোটো ছোটো বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মেলনটি সমৃদ্ধ হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যামন্দিরের কর্ণধার রাখহরি ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক শান্তনু পাল। সম্মাননীয় অতিথিগণ ভারতমাতা, শ্রীশ্রী ঠাকুর-মা-স্বামীজীর চিত্রপটে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানমঞ্চে অতিথিদের চন্দন ও পুষ্প দ্বারা স্বাগত জানানো হয়। সম্মেলনের প্রধান বক্তা তারকেশ্বর জেলা কলেজ ছাত্র প্রমুখ রুবেল পাল ছাত্রদের সামনে 'দেশ গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা' শীর্ষক বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। এরপর তারকেশ্বর জেলা সম্পর্ক প্রমুখ শান্তনু পাল 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেন। সভাপতি মহোদয় সংক্ষিপ্ত ভাষণে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে স্বামীজীকে পড়ার এবং জানার জন্য বার বার আহ্বান জানিয়ে কল্যাণ মন্ত্র দ্বারা কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। সম্মেলনে ৩৬ জন ছাত্র এবং ২৩ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে বিবিধ প্রতিযোগিতার আয়োজন

মহর্ষি দধীচি জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতার মানিকতলায় বিবেকানন্দ রোড-স্থিত দধীচি ভবনে গত ৮ সেপ্টেম্বর শিশু ও মহিলাদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্ট। দু'টি দলে শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, মহিলাদের মেহেন্দি প্রতিযোগিতা এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। রং-তুলি দিয়ে ছোটোরা নানা রঙবেরঙের ছবি আঁকে। ছবিগুলিতে প্রতিফলিত হয় শিশুমনের ভাবনাচিন্তা। উন্মুক্ত নীলাকাশে ডানা মেলে উড়ন্ত পাখি, প্রবহমান নদী, বসতিতে উত্তোলিত উড্ডীন রাষ্ট্রীয় ধ্বজ, সবুজাভ প্রকৃতির নৈসর্গিক চিত্র থেকে শুরু করে শিশুদের আঁকা ছবিতে ধরা দেয় সিদ্ধিদাতা গণেশ, দেবাদিদেব শিব ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিসমূহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেহেন্দি ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ১১ সেপ্টেম্বর মহর্ষি দধীচি জয়ন্তী সমারোহ অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়।

বাস্তববাদী বিদ্যাসাগর

কল্যাণ গৌতম

'প্যাট বরা (ভরা) বিদ্যে আর ব্যাং (ব্যাংক) বরা টাকা' অনেক বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক-শিক্ষকের আছে, কিন্তু তারা কখনও 'বিদ্যাসাগর' হতে পারবেন না। বিদ্যাসাগর হতে গেলে কেবল বিদ্যার সাগর হতে হবে তাই নয়, হতে হবে দয়ার সাগর আর সততার সাগর। অজেয় পুরুষত্ব, অক্ষয় দৃঢ়তা। মেরুদণ্ড বেচা বুদ্ধিজীবী কখনও বিদ্যাসাগর হতে পারবেন না। কখনোই না। দুর্বুদ্ধিজীবীদের 'বিদ্যাসাগর' নামোচ্চারণ মহাপাপ বলে গণ্য হবে।

অনুবাদক বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে আমরা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) নামটি জানলেও অনেকেই জানি না, তাঁর প্রথম অনুবাদ ছিল 'বাসুদেবচরিত'। নমুনা যা পাওয়া গেছে, অসাধারণ সেই গ্রন্থ, সুললিত ভাষা, অনুবাদ-কর্মের প্রথম পরীক্ষা—লিপিচাতুর্যে, লেখনশৈলীতে, ভাষা-সৌন্দর্যে অতুলনীয়। এর পাণ্ডুলিপিটি রচিত হয় সম্ভবত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকুরিরত অবস্থায়, ১৮৪২ থেকে ১৮৪৬ সালের মধ্যে। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার অনুমান করেছিলেন, এই আখ্যানে হিন্দুর ধর্মগ্রন্থের কাহিনি গৃহীত হয়েছিল বলে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ সম্ভবত এটি কলেজের পাঠ্য গ্রন্থরূপে গ্রহণ ও প্রকাশ করতে সম্মত হননি। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন, 'বাসুদেবচরিত' বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরে আর এই পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর নিজে তা পরে প্রকাশ করতে চেয়ে খুঁজে পাননি। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বইটি কীটদষ্ট অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিলেন এবং জীবনীকারদের দেখিয়েও ছিলেন।

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। এই বোধে নিজেকে পরবর্তী সময়ে সম্ভবত পরিচালিত করেছিলেন। তারই অনুভবে নিজের জীবনের লক্ষ্য স্থির করে থাকবেন। হিন্দু ধর্মের প্রচার করতে গিয়ে সাহেবদের চটালে, তাঁর সমাজসংস্কারের কাজ পাছে বাধা পায়, সেজন্য অন্যভাবে হিন্দু ধর্মের সামীপ্যে সান্নিধ্যে বিরাজ করলেন তিনি।

মনে রাখতে হবে তিনি যখন কর্মজীবন শুরু করছেন (১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর) কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে তার বছর ছয়েক আগে (১৮৩৫ সালে) মেকলে ভারতীয় সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত নড়িয়ে দিয়ে বোধন করে গেছেন ব্রিটিশ ভারতের বৌদ্ধিক চিন্তাচেতনা।

মেকলের নীতি অনুসরণ করে ভারতে ব্রিটিশরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী পাঠ যথাসম্ভব পাঠ্যসূচিতে রাখবে না, হিন্দু ধর্মের গরিমা-প্রকাশক কোনো পাঠ তো নয়ই। চাকরী জীবনের প্রথমে এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই বিদ্যাসাগরকে আমরা বিশেষভাবে প্রকাশ হতে দেখি। কেউ কখনও অস্বীকার করতে পারবেন না, বিদ্যাসাগরের আনা নবজাগরণ ছিল হিন্দু-নবজাগরণ। তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, নিজের আরব্ধ কাজ করার জন্য শাস্ত্রীয় যুক্তি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর বহু রচনাই হিন্দু ধর্ম আধারিত।

বিদ্যাসাগরের জীবনে আরও একটি ঘটনা থেকে মনে হয়, তিনি ব্রাহ্ম কিংবা খ্রিস্টান মহিলাদের তুলনায় হিন্দু মহিলাদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে স্ত্রী শিক্ষাবিদ মেরি কার্পেন্টার ভারতে আসেন। তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বেথুন স্কুলে একটি শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইলেন। কারণ এতদিন বালিকা বিদ্যালয়ে পুরুষেরা পড়াতেন। বিদ্যাসাগর প্রথমে কার্পেন্টারকে সঙ্গ দিলেও পরে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিলেন। যুক্তি ছিল সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে উপযুক্ত বয়স্কা মেয়ে পাওয়া যাবে না। বিপুল সামাজিক বাধা আসবে তাদের প্রতি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটা তো হিন্দু ঘরের মেয়েদের জন্য সত্য। শিক্ষিকা হিসেবে তো ব্রাহ্ম মহিলারাও আসতে পারতেন; খ্রিস্টান মহিলারাও আসতে পারতেন, তাদের জন্য তো সত্য নয়! তারা তো অনেকেই শিক্ষিত ছিলেন, সামাজিক বাধাও পেতেন না সেভাবে। তাহলে কি বিদ্যাসাগর মনে করেছিলেন, শিক্ষিকা হিসেবে হিন্দু মেয়েরা সুযোগ না পেলে, শিক্ষা জগতে ব্রাহ্ম

এবং খ্রিস্টান শিক্ষিকারা দাপিয়ে বেড়াবে? ধর্মীয় প্রভাব ফেলবে? একজন হিন্দু পুরুষকে শিক্ষা দেওয়া আর একজন হিন্দু নারীকে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে অনেক ফারাক। শিক্ষিকা হিসেবে হিন্দু নারীর মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরূপ চিন্তন তৈরি করে দিলে তা হিন্দু সমাজে দীর্ঘকালীন ক্ষতি করে দিতে পারে, এটা পরিষ্কারভাবে হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। তাই সেই ফাঁদে পা দেননি।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী চিন্তাবিদেরা সব সময় প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগরকে ধর্ম-উদাসীন মানবতাবাদী চরিত্র হিসেবে, তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বকে। কিন্তু মূল সত্যিটা হলো, পরাধীন ভারতবর্ষে নিজেকে কীভাবে উপস্থাপন করলে দেশের সামাজিক সংস্কারের কাজ সুসম্পন্ন হয়, সে ব্যাপারে তিনি বাস্তববাদী ছিলেন। সেই পথে যেতে হলে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপোশ করেছেন। আর তার জন্যই ধর্ম আধারিত সমাজ সংস্কার করতে পেরেছেন। 'ধর্ম বিযুক্ত বিদ্যাসাগর' বলে কোনো কথা হয় না।

বিদ্যাসাগরের ধর্মে মতি না থাকার পেছনে একটি মনস্তাত্ত্বিক নিবৃত্তি হয়তো কাজ করে থাকবে। গরিব ঘরের ছেলেটি জানতেন তার ঠাকুরদা (পণ্ডিত রামজয় তর্কভূষণ) সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়েছেন; ঠাকুমা (দুর্গাদেবী) প্রবল দুরবস্থায় পড়েছেন তার ছয় ছেলে-মেয়ে নিয়ে; সুতো কেটে বাজারে বিক্রি করে যে মহিলাকে সংসার চালাতে হয়; যার ১৫ বছরের ছেলেকে কাজ জোটাতে গিয়ে কলকাতার পথে পথে চলতে গিয়ে ক্ষুধায় মূর্ছা যেতে হয়। সেই পরিবারের একজন সংবেদনশীল অতল জ্ঞানী সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অথচ মানব দরদির ধর্মে বিশেষ মতি থাকলে, 'ঘর পোড়া গোরুর সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরানো'-র মতো অবস্থা হয় পরিবারের। তাই তিনি নিজেও সদাসর্বদা খেয়াল রাখেন, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম দর্শন যেন তাকে অন্তত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী না করে তোলে। আর বিদ্যাসাগর তো সন্ন্যাসীই ছিলেন; মননে, কর্মে বাস্তববোধে। প্রাচীন ঋষিদের মতো যার প্রজ্ঞা আর পাণ্ডিত্য, মানুষের জন্য যার অপরিমিত দয়া বাঙ্গালি রমণীর মতো কোমল করে তোলে, তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী না হয়ে যান না। তিনি পুণ্যশ্লোক, তিনি পবিত্র ঋষি।

তখন প্রগতিশীলতা মানেই ছিল ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়া, কিন্তু বিদ্যাসাগরকে ব্রাহ্ম হতে দেখিনি আমরা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ ব্রাহ্ম মনীষীর সঙ্গে তাঁর চির ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তিনি হিন্দুই থেকে গেছেন। বরং প্রিয়পাত্র শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম হয়ে গেলে তা তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত, ব্যথিত করেছিল। বিদ্যাসাগরের লেখা চিঠিপত্রের শীর্ষে অবশ্যই স্থান পেত 'শ্রীহরি শরণম্'। এটা দেখবার মতো ব্যাপার। শুধুই কি আচার পালন!

হিন্দুধর্মের প্রতি অকারণ বিদ্বেষ ও কটূক্তি তিনি কখনোই মেনে নেননি। এক সময় এক ব্রিটিশ বিচারক একটি মামলার রায়দানের সময় প্রসঙ্গ-বহির্ভূতভাবে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কটু কথা বলেছিলেন, অশালীন কথা বলেছিলেন; তার প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর, গর্জে উঠেছিলেন তিনি। কলকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় নেতৃত্ব দিলেন বিদ্যাসাগর। পাঁচ হাজার গণ্যমান্য মানুষের স্বাক্ষর সংবলিত একটি চিঠি পাঠালেন ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সেক্রেটারিয়েটে। চিঠির গুরুত্ব অনুভব করে ব্রিটিশ সেক্রেটারিয়েট ভারত সরকারকে নির্দেশ দিল, সেই বিচারককে সতর্ক করে দিতে হবে। জয় হলো বিদ্যাসাগরের, জয় হলো হিন্দুর।

হিন্দুধর্মের যে দশটি মানবিক গুণ থাকলে যিনি যথার্থ ধার্মিক হতে পারেন, তার সমস্ত গুণই বিদ্যাসাগরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই— ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ। যদি তাই হয় তবে তিনি অবশ্যই ধার্মিক হিন্দু।

বিদ্যাসাগর গীতার উপদেশ অনুসারে চলবার কথা উচ্চারণ করেছেন। তাঁর স্নেহধন্য ও পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার অমূল্য চরণ বসু (১৮৬২-১৮৯৮; ১৮৮৬ সালে কলকাতা মেডিক্যাল স্কুল থেকে এমবি উত্তীর্ণ) একবার বিদ্যাসাগরকে ধর্মবোধ ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'গীতার উপদেশ অনুসারে চললেই ভালো হয়।' কোনো এক ভয়াবহ লঞ্চডুবিতে প্রায় ৮০০ জন আরোহীর মৃত্যু হলে তিনি সখেদে বলে উঠেছিলেন, 'দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, ঠাকুরের ভক্তেরা অভিমত প্রকাশ করে বলেন, বিদ্যাসাগর ঈশ্বর মানেন না, তিনি নাস্তিক। শ্রীরামকৃষ্ণ মত প্রকাশ করে বলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ না থাকলে কোনো মানুষ এমন জায়গায় পৌঁছাতে পারেন না। তিনি কলকাতার বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন।

নানান সমাজ সংস্কারের কাজে তিনি শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও তার সুলুকসন্ধান করেছিলেন, গভীরে গিয়েই পাঠ করেছিলেন শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্য। কিন্তু তবুও তিনি নিরীশ্বরবাদী। বলা হয়ে থাকে বুদ্ধের পর বিদ্যাসাগরই প্রথম ভারতীয় মনীষা যিনি ঈশ্বর নিয়ে চিন্তা করেননি। গৌতমবুদ্ধ যেখানে হিন্দুদের দশাবতারের একজন হয়ে উঠলেন তবে কেনই-বা ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঈশ্বরচন্দ্র' হয়ে উঠবেন না? যিনি কর্মফলের আশা না করে নিষ্কাম কর্ম করে গেছেন এবং অক্ষয় মনুষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন, গীতার উপর আস্থা রেখেছিলেন, তিনি তো কর্মযোগী হিন্দু সন্ন্যাসীই হবেনা! তাই নয় কি?

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। এবং নিঃসঙ্গ। তাই তো ভক্তের কাছে তাঁকে ছুটে আসতে হয়— 'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর/তুমি তাই এসেছ নীচে। /আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,/তোমার প্রেম হতো যে মিছে।' নিঃসঙ্গতার গ্রাসে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রও। দুশো বছরেও নিঃসঙ্গ পথিকৃৎ তিনি। এখন প্রশ্ন, 'ঈশ্বরের পুত্র' কে হতে পারেন? বিদ্যাসাগর যদি ঈশ্বর-পুত্র হন, তবে কি তাপিত, দুঃখী মানুষের জন্যই তাঁর ধরাধামে আসা?

(তথ্যসূত্র : কল্যাণ গৌতমের বিদ্যাসাগর বিষয়ক নানান নিবন্ধ থেকে সংকলিত। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বিদ্যাসাগর বিষয়ক বিবিধ জীবনীগ্রন্থ।)

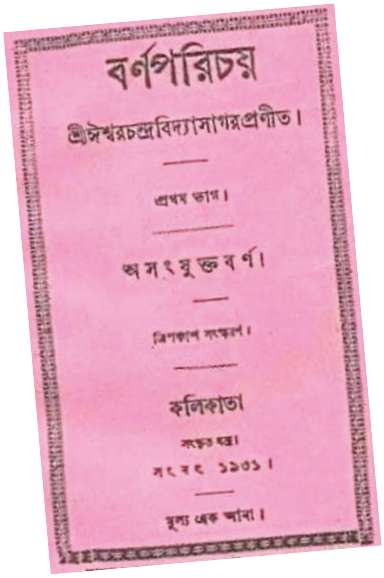

ভাষাশিল্পী বিদ্যাসাগর

দেবায়ন চৌধুরী

'রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণের ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা 'মরা' বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল। এই পুরাতন পৌরাণিক নজিরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ওই নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনোরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড়ো ও আমরা এত ছোটো, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।'

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বক্তব্যের সূত্রে এই প্রশ্ন মনে আসা সঙ্গত যে, আমরা কি সত্যি বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করবার অধিকারী? অধিকার এমনি এমনি আসে না। অর্জন করতে হয়।

ভাষাশিল্পী বিদ্যাসাগরকে নিয়ে দু-এক কথা বলার চেষ্টা করছি। পাঠক না-হয় 'আস্পর্ধা' ভেবেই ক্ষমা করে দেবেন। আসলে 'বর্ণপরিচয়' যাঁর হাত ধরে, এই 'কথামালা' তাঁরই বইকী।

(২)

"শিল্পী দুই রকমের— স্রষ্টা ও সংস্কর্তা। স্রষ্টা তিনিই যিনি রচনা করেন যাহা আগে ছিল না। আর আগে যাহা ছিল তাহাতে তিনি নবরূপ দেন, নবশক্তি সঞ্চার করেন, তিনি সংস্কর্তা। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী এবং এখানে তিনি আমাদের দেশে অদ্বিতীয়। বাংলা সাহিত্যের গদ্যরীতি কেন যে পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক আর কাহারো দ্বারা না হইয়া (—তখন দেশে প্রতিভাশালী শক্তিমান বাঙ্গালির অভাব ছিল না—) বিদ্যাসাগরের দ্বারা সাধিত হইল, তাহার নিগূঢ় কারণ এখানেই মিলিবে। বিদ্যাসাগর যেন বাঙ্গালির মানসিক ও সামাজিক জীবনের সংস্কর্তা।" —এভাবেই সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইতে বিদ্যাসাগরের অবস্থান চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তবে শিল্পীর যে দ্বি-বিভাজন করেছিলেন, তার সঙ্গে সামান্য মতভেদ রয়েছে। আমাদের মনে হয়, স্রষ্টা ও সংস্কর্তা উভয়ের বিশিষ্টতাই মূর্ত হয়ে উঠেছিল বিদ্যাসাগরের কলমে।

১৩০২ সালের ১৩ শ্রাবণ, বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ সভায় এমারেল্ড থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন 'বিদ্যাসাগর চরিত'। এবং এই 'যথার্থ মানুষ'-এর বহুমাত্রিক পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বললেন— 'তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।' এবং নিঃসংশয়ে ব্যক্ত করলেন অভিমত— 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।' তাঁর মতে, বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা বিদ্যাসাগরের হাত ধরেই। পূর্ববর্তী গদ্যভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করে জানালেন— 'বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার- ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।' বক্তব্যকে সরল, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে প্রকাশ করবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যের নিজস্ব ছন্দটিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন এবং এই তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই হলো যতিপ্রয়োগ। বাক্যের গঠনের মধ্যে এল 'লালিত্য ও নমনীয়তা'। বাংলা সাধু গদ্যের প্রথম 'পূর্ণাঙ্গ ও সরস রূপটি' প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর হাত ধরেই। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে আবার উদ্ধৃত করছি— 'বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত সুবিন্যস্ত সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন, এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল প্রতিহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন— কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।'

এখানে বলে রাখা ভালো যে, বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতিকেই মূলত আজও আমরা অনুসরণ করে চলেছি— সে পদান্বয়ই হোক কিংবা যতিবন্ধন।

(৩)

'বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী' বিদ্যাসাগরের লেখা যে বইটির কথা না বললেই নয়, সেটি হলো— 'বর্ণপরিচয়।' ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগ ছাপা হয়েছিল মাত্র ৩০০০ কপি। আর '১৮৯০-এর মধ্যে ১৫২টি সংস্করণ পেরিয়ে, সে বইয়ের সংখ্যা তখন দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজারে'। এই বিপুল

জনপ্রিয়তা আজও অম্লান। প্রাথমিক বাংলা শিক্ষার ইতিহাসে 'বর্ণপরিচয়' অদ্বিতীয়। বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালা সংস্কার করেন। তৈরি হয় 'ঢ়', 'ড়' ও 'য়'। অনুস্বার (ং) ও বিসর্গ (ঃ)-আগে স্বরবর্ণ বলে ধরা হতো। বিদ্যাসাগর তাদের দিলেন ব্যঞ্জনবর্ণের মর্যাদা। আর দীর্ঘ (ঋ) ও দীর্ঘ (ঌ) বর্ণদুটি বাদ দিলেন। 'বর্ণপরিচয়' পড়ার মধ্যে একধরনের অনাবিল আনন্দ আছে যা রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল। বর্ণের সঙ্গে শব্দ, শব্দের সঙ্গে বাক্য, চেনা জগতের গল্পের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধের শিক্ষাও দেন বিদ্যাসাগর। যে হিতবাদী দর্শন বিদ্যাসাগরের সারা জীবনের নানা কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত, তারই নির্যাস যেন এই 'বর্ণপরিচয়'-এ। এক অর্থে এটি বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীও বটে। আমাদের মনে পড়তে পারে 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগের দশম পাঠ— 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড়ো দোষ। যে চুরি করে, তাহাকে চোর বলে। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না।' এবং এই পাঠেই পাই ভুবনের কথা। চুরি করে ফাঁসির আজ্ঞাপ্রাপ্ত হলে সে দেখা করতে চেয়েছিল তার মাসির সঙ্গে। এবং দাঁত দিয়ে মাসির কান কেটে নিয়ে বলেছিল— 'যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার হইল।' বোঝাই যাচ্ছে, 'বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় শুধু ছোটোদের নয়, বড়োদের জন্যও।'

আজ যখন তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয়কে দেখতে পেয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ হচ্ছি, সে সময় ফিরে পড়তে ইচ্ছে করে 'কথামালা'। গল্পের শেষে নীতিবাক্যগুলি অমোঘ হয়ে ধরা দেয়— 'মানুষের স্বভাব এই, অন্যকে যে কর্ম করিতে দেখিলে গালাগালি দিয়া থাকে, আপনারা সেই কর্ম করিয়া দোষ বোধ করে না।' কিংবা 'মানুষের মৃত্যুর পর মানুষের দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অপেক্ষা মানুষের দেহে প্রাণ থাকিতে প্রাণ রক্ষা করা অধিকতর প্রশংসনীয়।'

একজন শিশু তার মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, তারপর সে যাতে এই ভাষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, তার জন্য বিভিন্ন ধরনের গল্প অনুবাদ করছেন। ব্যক্তিনির্মাণের প্রকল্প বিদ্যাসাগরের ভাবনায় সদাজাগ্রত ছিল। তিনি কী বলছেন, কাদের জন্য বলছেন, সেই অনুযায়ী গদ্যকে গড়েপিটে নিচ্ছেন। 'বোধোদয়'-এর বিজ্ঞাপনে পাই— 'অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক-বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশয়ে অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, বলিতে পারি না।' তিনি বিদ্যাসাগর, ছাত্রপাঠ্য বই লিখছেন, কৃতকার্যতা নিয়ে তাঁর না ভাবলেও চলত, বরং ঠিক তার উলটোপথে চলে প্রতিনিয়ত নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছি তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্ব ও বিনয়।

'বোধোদয়' বইতে 'বাক্যগঠন— ভাষা' শীর্ষক অংশে লেখক বলছেন— 'ইংরেজেরা এক্ষণে আমাদের দেশের রাজা, সুতরাং ইংরেজি আমাদের রাজভাষা; এ নিমিত্ত, সকলে আগ্রহপূর্বক ইংরেজি শিখে। কিন্তু অগ্রে মাতৃভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিখা কোনও মতে উচিত নহে। পূর্বকালে, ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এ ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক ভালো ভালো গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত ভালো না জানিলে, হিন্দি, বাংলা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।' ভাষার সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ককে অবলীলায় ইঙ্গিত করলেন। আরেকটি কথা, বিদ্যাসাগরকে যদি আমরা সত্যি মান্য করতাম, তাহলে সংস্কৃত ভাষার প্রতি এত অবহেলা দেখাতাম না। আসলে এও এক শেকড় থেকে সচেতনভাবে বিচ্যুত করার রাজনীতি। আত্মঘাতী বাঙ্গালির থেকে এর চেয়ে বেশি কীই-বা আশা করা যায়?

(৪)

আমরা সকলেই জানি 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' হলো 'ভারতীয় ভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।' রসজ্ঞ সাহিত্য সমালোচনা কেমন হওয়া উচিত তার একটি রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন বিদ্যাসাগর।

ভাষার অধিকার জন্মায় ব্যাকরণ শিক্ষার মাধ্যমে, তাই লিখিত হলো— 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'। প্রসঙ্গত, পুলিন দাশের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে— 'অন্যদিকে বাংলা শব্দ ও তাদের বিশিষ্ট প্রয়োগবিধি সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করে দেবার কাজেও তাঁকেই হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। লিখতে শুরু করেছিলেন প্রয়োগার্থ অভিধান শব্দমঞ্জরী। যেহেতু মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার করতে হলে সর্বাগ্রে চাই বাংলা ভাষাকে সম্পন্ন করে তোলা। সংস্কৃত সে কাজে সহায়তা করবে মাত্র।'

একজন শিশুর বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা পর্যন্ত ভাষার যে ভূমিকা, বিদ্যাসাগর তার সমস্ত দিক নিয়েই চিন্তাভাবনা করেছেন। হিতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যেখানে মিলিত হয়েছে সাহিত্যিকের মন। অস্তিত্বের নির্মাণে ভাষার ভূমিকা সূত্রেই বিদ্যাসাগর আজ বড়ো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। তিনি ভাষাশিল্পী, জীবনশিল্পী। □

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫'৫", সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য।

যোগাযোগ : ৮৭৭৭৮১৬৪০০

রাজা রামমোহন রায়ের জাতীয়তাবাদী মনন

অনীশ দাশ

অবধারিতভাবে একথা সত্য যে, আধুনিক ভারতের নবজাগরণের প্রথম প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার দুর্লভ অধিকারী যাঁর হাত দিয়ে সার্থকভাবে ভারতে হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন ত্বরান্বিত হয়। রাজা রামমোহন সংস্কৃত, বাংলা, আরবি, ফার্সি, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, ফরাসি ভাষা-সহ একাধিক ভাষা অত্যন্ত ভালো জানতেন; নানা ভাষায় একাধিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন; অত্যন্ত বিচারকুশলী ও ইতিহাসসচেতন ছিলেন এবং তৎকালীন আইনও অত্যন্ত ভালো জানতেন। বস্তুত যে ব্যক্তি সাহসী এবং একাধারে বহুবিধ বিদ্যার্জনের ক্ষমতা রাখেন, তিনিই সমাজের কুরীতি দূর করে সংস্কারসাধন করতে পারেন।

যে যুগসন্ধিক্ষণে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়কে আগে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে যখন তাঁর জন্ম হয়, সেই সময়ে পাশ্চাত্যের আগ্রাসী বেনিয়া সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামি আগ্রাসনে সুপ্রাচীন হিন্দু সভ্যতার সংঘাতের চ্যুতিবিন্দু দেখা যাচ্ছে।

'আমাদের সব কালো আর ওদের সব ভালো'--- এই মনোভাব সর্বত্র স্পষ্ট। পলাশীর যুদ্ধের পর কলকাতাকেন্দ্রিক যে নব্যবাঙ্গালি সমাজ গড়ে উঠেছিল, সেই সমাজের মধ্যে একদিকে যেমন সহস্রাধিক বছরের ইসলামি শাসনের ফলে স্বাভাবিক দাসত্বভাব দানা বেঁধেছিল, তেমনই অন্যদিকে শিল্পবিপ্লব ও আধুনিক বিজ্ঞানের জান্তব বিস্ফারককে পুঁজি করে আসা বিজেতা নব্য ইউরোপীয় বণিক শাসকবর্গের সংস্কৃতিকে আপন করে নেবার মানসিকতাও প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে বঙ্গপ্রদেশে যে বাবুসমাজের সৃষ্টি হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উঠে এসেছে শিবনাথ শাস্ত্রী বিরচিত রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ নামক গ্রন্থে (রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ খ্রি. 'ভূমিকা', পৃষ্ঠা-১২)।

সেই গ্রন্থে রয়েছে সমাজের বাবুশ্রেণীর চিত্র। এই প্রকারের পরস্বত্বভোগী আমুদে অভিজাতবর্গ সর্বদেশে সর্বকালে সর্ব সমাজেই থাকে। তাদের দিয়ে সমাজের উচ্চ-নীচ বিচার করা যায় না যেহেতু, তারা সমাজের জ্ঞান ও ন্যায়-নৈতিকতার দণ্ড ধারণ করে না। কিন্তু সমাজের উপরতলার সেই বাসিন্দারা যাঁরা জ্ঞান, বিজ্ঞান, নীতি-নৈতিকতা, সমাজশৃঙ্খলা, ধর্ম প্রভৃতি মূল্যবোধের ধারক-বাহক হন, তাঁরা যদি তাঁদের স্বধর্ম থেকে চ্যুত হন, তখনই সাধারণ জনগণ কোনোরূপ দিশা না পেয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। বস্তুত, মাথায় পচন ধরলে সমগ্র দেহেই পচন আরম্ভ হয়। ভারতীয় সমাজের শিখরস্বরূপ সেই ব্রাহ্মণসমাজেরও তখন পচন ধরেছিল। সেই পচনের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থে (রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ খ্রি. 'ভূমিকা', পৃষ্ঠা-১৩)।

সহজেই অনুমেয় যে, কোন সামাজিক অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন ভারতাত্মার প্রথম পথিক। অন্যদিকে, তাঁর বেড়ে ওঠার সময়ে ফরাসি দেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্লোগান উঠেছে; পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি জ্ঞানদীপ্তির যুগ অতিক্রম করে ক্রমশ প্রবেশ করছে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে। একদিকে আমেরিকা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে উচ্ছিন্ন করে গণতান্ত্রিক মুক্তির প্রেরণাস্থল হয়ে উঠেছে; অন্যদিকে, ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশের আত্মবিকাশের মোহে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয়ভাবে নয়া- উপনিবেশবাদ প্রসারে অগ্রণী হয়ে উঠছে। এর ফলে একদিকে প্রাচীন শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ, সংস্কার, আচার-বিচার যেমন ভাঙছে, তেমনই বিজেতার সংস্কৃতি, ন্যায়-নীতি, আচার-বিচার, ধর্ম প্রভৃতির প্রতি পরাজিত জাতির অন্ধ অনুকরণ ক্রমাগত বাড়ছে। জাতির এই সঙ্ঘাতময় বিভ্রান্তিকর অবস্থায়ই জন্ম নিয়েছিলেন রাজা রামমোহন।

জাতির এমত সংঘাতময় পরিস্থিতিতে এমন এক বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী সত্তার প্রয়োজন ছিল যিনি একাধারে পাশ্চাত্যের প্রয়োজনীয় নির্যাসটুকু জাতীয় জীবনে গ্রহণ করবেন এবং অন্যদিকে প্রাচ্যের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারকেও বহন করবেন। বস্তুত, এই দুয়ের সঙ্গমেই কোনো

সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ হয়। নবজাগরণের অর্থ কখনোই অন্য কোনো বহিরাগত সংস্কৃতির আর্থিক, সামাজিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ধার্মীয়—সকল দিক থেকে অন্ধ অনুকরণকে বোঝায় না। তবে দেশ ও কালগত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নবীন সামাজিক ভাবনার সংশ্লেষের মধ্যে দিয়ে পুরাতনের নতুনরূপে ব্যুত্থানই হলো নবজাগরণ। পাশ্চাত্যেও আমরা যে রেনেসাঁকে বুঝি সেই রেনেসাঁ বস্তুত প্রাচীন গ্রিক ও রোমান আদর্শের চতুর্দশ-ষোড়শ শতকের আধুনিক ইতালীয় সভ্যতার পুনর্বিকাশ। উত্তর-আধুনিক যুগে ইউরোপ, বিশেষ করে ফ্রান্স, যে সমাজচেতনার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তার অন্যতম পুরোধাব্যক্তি মিশেল ফুকোর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে প্রাচীন গ্রিক, রোমান বা ভিক্টোরিয়া সভ্যতার অনুধ্যানে। রাজা রামমোহনের মনন এমনই দ্বিবিধ ভাবের সুস্থ সঙ্গমে জারিত হয়েছিল। তাঁর মধ্যে যেমন বেদান্তের প্রাচীন উদগীথ ধ্বনিত হয়েছিল স্ত্রীশিক্ষা, পৈতৃক সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার, সহমরণ প্রথার বিলুপ্তির ক্ষেত্রে, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার গ্রহণীয় রূপও আত্তীকৃত হয়েছিল।

তবে তাঁর সংস্কার কর্মগুলির মধ্যে প্রকৃষ্টতম প্রকাশ ঘটেছিল ধর্মের পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে। রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে মিস কলেটের বক্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, '...he was above all and beneath all a religious personality.' রাজা রামমোহন রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে তাঁর অদম্য প্রজ্ঞাশক্তি নিয়োগ করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর প্রধানতম মননের ক্ষেত্র ছিল ধর্ম। খ্রিস্টমতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকার কারণে বা ইসলামের সগুণ একেশ্বরবাদ তাঁকে প্রভাবিত করলেও তিনি বস্তুত জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত একজন নিষ্ঠাবান পরমব্রহ্মনিষ্ঠ হিন্দু ব্রাহ্মণই ছিলেন। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন দেশাচারানুযায়ী তিনি নিজে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ আহারগ্রহণ করতেন না এবং অন্য ধর্ম ও জাতের লোকের সঙ্গে বসেও আহার্য গ্রহণ করতেন না। ব্রাহ্মণের উপবীত আমৃত্যু তাঁর দেহে শোভা পেয়েছিল। (তথ্যসূত্র : রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ খ্রি. 'ভূমিকা', পৃষ্ঠা-২১)। সারাজীবন তিনি এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ধ্যানেই সদামগ্ন থাকতেন এবং মৃত্যুকালেও তাঁরই আশ্রয়লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা জানিয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

তবে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাও বিস্মৃত হননি। তিনি যখন বেদান্ত শিক্ষার জন্য মানিকতলা স্টিটে বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই সময়ে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দুর একেশ্বরবাদী মননের চর্চা। কিন্তু তথাপি সেখানে খ্রিস্টীয় একেশ্বরবাদ ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানশিক্ষা দেবার ইচ্ছাও তাঁর মনে ছিল। রামমোহন রায় তাঁর প্রখর বাস্তববাদী মনন থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবের বৈরাগ্যবৃদ্ধি এবং ধর্মীয় আচারের বালুরাশিতে নিমগ্ন ভারতকে বাস্তবের স্বর্গে জাগরিত না করতে পারলে নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চিন্তন, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান সকল কিছুতেই ভারত পশ্চাদগামী হয়ে অজ্ঞানতিমিরেই চিরকাল নিপতিত থাকবে। এই কারণেই তিনি টোল, মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সর্বসাধারণের জন্য উপযোগী জাতীয় শিক্ষার প্রচলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। ভারতের তৎকালীন মুসলিম উলেমা বা হিন্দু ব্রাহ্মণবর্গের নিকট হতে আপামর জনগণের জন্য গ্রহণোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা তৈয়ারের প্রত্যাশা বৃথা ছিল। এর কারণ আগেই আংশিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর জন্যই তিনি ইংরেজি শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, দেশের আপামর জনগণকে সর্বজনীন শিক্ষায় শিক্ষিত করার দায়িত্ব দেশেরতৎকালীন শাসকের উপরই ন্যস্ত হয় (রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ খ্রি. 'ভূমিকা', পৃষ্ঠা-২২)।

এই আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, রাজা রামমোহন কারিগরি শিক্ষার উপরই জোর দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাকে সমাজকল্যাণ ও জাগতিক উন্নতির সোপানরূপেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ধর্মের সঙ্গে কোনোরূপ সম্বন্ধ রেখে শিক্ষা দেবার নীতির তিনি বিরোধী ছিলেন বলেই মনে হয়। তবে তাঁর অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের পাঠ্যক্রমে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। একইসঙ্গে লক্ষণীয়, রাজা রামমোহন সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে কতটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন। একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলে বিষয়টি হয়তো স্পষ্ট হবে। একদা খ্রিস্টমত প্রচারক ডাফ সাহেব এদেশে এসে ইংরেজি শিক্ষা দেবার জন্য যখন একটা ঘর ভাড়া নেবার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় ৪ টাকা মাসিক মূল্যে চিৎপুরে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার ঘরটি রাজা রামমোহন ডাফ সাহেবকে ভাড়া দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি ছাত্রসংগ্রহ অবধি করেছিলেন। প্রথমদিন ডাফ সাহেব ছাত্রদের একটি বাইবেল পড়ার জন্য দিলে হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়। তাদের ভয় হয়েছিল এই অছিলায় যদি সাহেব তাঁদের ধর্মান্তরিত করতে চান!

সেই সময় রাজা রামমোহন রায় তাদের বাইবেল পড়তে বলে বলেন যে তিনিও ওই গ্রন্থ পড়েছেন। কিন্তু তাতে কি তিনি খ্রিস্টান হয়ে গেছেন? সুতরাং এই একটি দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে তিনি শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে কতটা উদার ভাবনা পোষণ করতেন। আবার যাতে ব্রাহ্মসভার কোনো ব্যক্তি খ্রিস্টান না হয়ে যান তার জন্যও তিনি ওই ইংরেজি স্কুল নিজে প্রতিদিন এসে তদারক করতেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, তিনি জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারে উদার হলেও এমন উদার ছিলেন না যে বাইরের বিজাতীয় সংস্কৃতি আমার কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিলুণ্ঠিত করে দিয়ে গেল অথচ আমি সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকলাম। আসলে, ঘরে আলো-বাতাস ঢুকতে দেবার জন্য অবশ্যই জানলা-দরজা খোলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যদি সেই জানলা দিয়ে ঝড়ো হাওয়া ঢুকে আমার ঘর লণ্ডভণ্ড করে দেয় তবে সেক্ষেত্রে দোষটা আমারই, কারণ আমিই ঠিক সময়ে জানলা-দরজা বন্ধ করিনি।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসে যে, রাজা রামমোহন রায়কে যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রচার করা হয় সেই ধর্ম কি হিন্দুধর্ম থেকে বিজাতীয় কোনো ধর্ম? তাঁর শিকড় কি কোনোভাবেই হিন্দুধর্মের

সঙ্গে জুড়ে নেই?

এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সনাতন ধর্মের দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। বস্তুত তিনি যে সংস্থা প্রণয়ন করেছিলেন তা ছিল 'আত্মীয় সভা'।

পরবর্তীতে আমরা মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং আরও শেষে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা রূপায়িত যে ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মধর্মের সাক্ষাৎ পাই, তার সঙ্গে আত্মীয় সভার চরিত্রগত অনেক পার্থক্য ছিল। কোনো ধর্ম যেমন কেবল ভাব-ভক্তি, অতীন্দ্রিয় অনুভব প্রভৃতিকে উপজীব্য করে চলতে পারে না, তার যেমন একটা বৈচারিক ক্ষেত্রের দরকার আছে, তেমনই কেবল যুক্তিকে আশ্রয় করে কোনো ধর্মীয় আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজে প্রথম থেকেই এই সংঘাত বর্তমান ছিল। সেই সংঘাত থেকে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাজন ও রূপভেদ সৃষ্টি হয়। আজ আমরা যাকে ব্রাহ্মধর্ম বলে চিনি তার আদর্শ নির্মিত হয়েছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে।

অন্যদিকে, মূলধারার ব্রাহ্ম-আদর্শের পরিপন্থী শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত কেশবচন্দ্র সেনের হাত ধরে ভাবময় ও ভক্তিরসের প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে কেশবপন্থী এই ব্রাহ্মভাবধারা সমাজে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়। তবে আত্মীয় সভার আদর্শের সঙ্গে পরবর্তীতে গড়ে ওঠা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কোনো দার্শনিক মিল ছিল না। বস্তুত রামমোহনের মননে ক্ষুরধার যুক্তির প্রাবল্যই ছিল বেশি। তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম রূপকার ছিলেন ঠিকই কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার প্রভৃতির মতো বাংলা গদ্যকে রসবোধের অলংকার দিয়ে সাজাতে পারেননি। তবে তাঁর হাত দিয়ে বাংলা ভাষা-সহ হিন্দুধর্ম অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় অর্জন করেছিল। প্রথমত, তিনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামে বঙ্গের সুপ্রাচীন ব্যাকরণশাস্ত্রগুলির অন্যতম একটি ব্যাকরণশাস্ত্র রচনা করেন। তাঁর আগে যে ব্যাকরণগুলি ছাপা হয়েছিল সেগুলি কিছু ইংরেজি কিছু ল্যাটিন প্রভৃতি বিদেশি ভাষায় পড়তে হতো। এই ব্যাকরণগুলিতে, এমনকী উইলিয়াম কেরির প্রকাশিত ব্যাকরণেও, বহিরাগত বিদেশি শাসকবর্গ যাতে সহজে বাংলা শিখতে পারে তার প্রচেষ্টা ছিল।

কিন্তু একমাত্র রাজা রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণের হাত ধরেই বাংলা ভাষার পূর্ণ মার্জিত ও মান্য রূপ প্রকাশ পায়। এর কারণ, তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই বাংলা ভাষার মান্যরূপকে সংস্কৃত মান্য ব্যাকরণের ও গদ্যধর্মিতার ছাঁচে গঠন করেছিলেন। তিনি একাজ না করলে বাংলা ভাষার মান্যরূপে আরবি-ফার্সি শব্দবহুল নানা বিজাতীয় ভাষাশৈলীর প্রভাব এসে দানা বাঁধত। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষায় দার্শনিক বিশ্লেষণী সাহিত্য প্রথম তাঁর হাত ধরেই সৃষ্টি হয়। দার্শনিক সাহিত্যে রাজা রামমোহনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো দুটি। প্রথমত, তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত একাধিক প্রাচীন বেদান্তগ্রন্থকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। যেমন, আচার্য শঙ্কর বিরচিত আত্মানাত্মবিবেকঃ, সদানন্দ যোগীন্দ্র রচিত বেদান্তসারঃ, বজ্রসূচী, বেদান্তগ্রন্থঃ প্রভৃতি। মনে রাখতে হবে, যে সময়কালে তিনি এই অনুবাদগুলি করেছিলেন, সেই সময় বঙ্গ তথা ভারতে সংস্কৃতচর্চার অভাব ঘটেনি। কিন্তু নব্যবাংলা শিক্ষিত বিদেশি সাহেব এবং সর্বসাধারণের সুবিধার্থেই তিনি এই সকল গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন।

এই খ্রিস্টান সাহেবরা অজ্ঞ সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে যাতে ধর্মান্তর করাতে না পারেন এবং ভুলভাবে ধর্মপ্রচার করতে না পারেন, সেই কারণেই তিনি এই সকল দর্শনশাস্ত্র অনুবাদে প্রয়াসী হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মূলত অজ্ঞ খ্রিস্টান পাদরিরা ভুলভাবে মানুষকে প্রভাবিত না করেন এবং বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ সাধারণ জনতা যেন তা অবহিত হন। বস্তুত, যদি না ভারতীয় হিন্দুরা নিজের শাস্ত্র ভালো করে না জানেন তবেই তাঁদের পক্ষে ধর্মান্তরিত হবার সম্ভাবনা প্রবল। আগেই বলা হয়েছে, তৎকালীন পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বেদান্তচর্চার অভাব ছিল। এছাড়াও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, অদ্বৈতবেদান্তের দর্শনে যে একত্বের বার্তা আছে সেই একত্বতত্ত্ব দিয়েই সকল ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, বিতর্ক ও সৌহার্দ্যের বোধ জাগরিত হতে পারে। তিনি খ্রিস্ট ও ইসলামের একেশ্বরবাদী মতের সঙ্গে বেদান্তের একসত্তাবোধের অপূর্ব মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, বিশ্বমানবের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণ যে ভিত্তিভূমি থেকে হতে পারে তাহলো বেদান্ত, কারণ তার অপূর্ব যুক্তিসিদ্ধতা ও সর্বজনীনতা সকল দেশের সকল কালের লৌকিক সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। রাজা রামমোহনের মন মুগ্ধ হয়ে যায় সেই বৈদান্তিক বাণীতে যেখানে উপনিষদের ঋষি গেয়েছেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।।

অর্থ : যিনি আত্মাতেই সকল বস্তুকে আবার সকল বস্তুতে আত্মাকে দর্শন করেন তিনি সেই রূপ দর্শনের ফলে কাউকে ঘৃণা করেন না। সর্ব ভূতে একত্বদ্রষ্টা সেই জ্ঞানীর মোহই-বা কী আর শোকই-বা কী? (ঈশোপনিষদ-৬, ৭)

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন, 'বাস্তবিক রাজা অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এক ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণ সাধনকেই প্রকৃত ধর্ম বলে বিশ্বাস করিতেন। ইহার বিরোধী যাহা কিছু ধর্মমত ও ধর্মানুষ্ঠান তাহা তিনি অসার ও অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন।' (পৃষ্ঠা-৩৩৬)

তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্মের ভিত্তি বেদান্ত হলেও তাতে সকল ধর্মমতের সম্মিলনের স্থান ছিল। তিনি বেদান্তের বিশ্বজনীন ধর্মকে একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে সর্বসাধারণের ব্রহ্মসাধনের ও ব্রহ্মোপলব্ধির পথ প্রশস্ত করেছিলেন। কিন্তু সেই সাধনমার্গকে তিনি কোনো আচার, বিচার বা প্রথার বেড়াজালে আবদ্ধ করতে চাননি। একারণেই তিনি হিন্দুর প্রতিমাপূজা প্রভৃতি বাহ্য-আচারের বিরোধিতা করেছিলেন (রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ খ্রি.

'ভূমিকা', পৃষ্ঠা-১৯)।

বস্তুত তাঁর প্রণীত ধর্মে পাশ্চাত্যের ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথার, কান্ট প্রভৃতির প্রভাব থাকায় তাঁর কল্যাণমুখী মতাদর্শে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিচারের কৌশলী দীপনই প্রাধান্য পেয়েছিল। কোনো সংস্কার, আচার ব্যতীত সাধক ও সাধ্যের একান্ত ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসম্পর্কের বুনিয়াদ ছিল তাঁর প্রণীত ব্রাহ্মধর্মের রূপ।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, কোনো ধর্মমত কেবল বিচারকে আশ্রয় করে চলতে পারে না। আদর্শ কেবল কোনো মনস্বীর মননেই বিরাজ করতে পারে কিন্তু সমাজে সর্বসাধারণের মাঝে কোনো নান্দনিক আচার-বিচার ব্যতীত সেই আদর্শের বাস্তবিক রূপায়ণ সম্পন্ন হতে পারে না। এই কারণেই 'আত্মীয় সভা' পরবর্তীকালে কিছু বাহ্য আচারাদি সহায়ে একটি আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চরিত্রলাভ করে।

আরও কথা এই যে, তিনি বস্তুত হিন্দুর প্রতিমা পূজার বিরোধিতায় তাঁর প্রণীত বক্তব্যের সমর্থন গ্রহণ করেছিলেন বেদাদি হিন্দুর মূলগ্রন্থ উদ্ধৃত করেই। তাঁর অনূদিত বজ্রসূচীগ্রন্থ, গোস্বামীর সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের সংবাদ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর শাস্ত্রানুবন্ধী বিচারের সন্ধান পাওয়া যায় (রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ খ্রি. 'ভূমিকা', পৃষ্ঠা-১৮)।

এই প্রসঙ্গে রাজার চিন্তনশৈলীর একটি অভিনবত্ব অনুসন্ধানীয়। অধুনা অনেক তার্কিক যখন যখন তর্কসভায় বসেন, তখন তাঁরা তাঁদের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলেন যে, 'সনাতন শাস্ত্রের অমুক বিষয়টি বর্তমানে প্রাসঙ্গিক না হওয়ায় বর্তমানে বর্জনীয়।' অথবা কোনো শাস্ত্রের উদ্ধৃতি না উল্লেখ করেই তাঁরা স্বকপোলকল্পিতভাবে তাঁদের মতকে প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। কিন্তু রাজা রামমোহন এহেন বৈচারিক দুষ্টতা থেকে বিমুক্ত ছিলেন। তিনি যা-বলেছেন, সর্বত্র তাঁর মতের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও শ্রুত্যনুসারিণী বিচার অনুসরণ করেছেন। সতীদাহ প্রথা রোধের ক্ষেত্রেও তাঁর রচিত সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের সংবাদ নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, সতীদাহ বস্তুত শাস্ত্রীয় বিচারে অর্থাৎ বৈদিক প্রামাণ্যের প্রেক্ষিতে নিতান্ত অসিদ্ধ বিষয়। অভিপ্রায় এই যে, অথর্ব বেদের অষ্টাদশ খণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের প্রথম সূক্তে শ্মশানক্রিয়ানুষ্ঠানের বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণন আছে। সহমরণের বিষয়টিও সেখানে আছে। কিন্তু সেখানে ওই সহমরণ বিষয়টি যে স্ত্রীর ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে সতী নারীর স্বামীর প্রতি প্রেম ও হৃদ্যতাবশত আত্মত্যাগের প্রশংসা হিসেবে সহমরণের স্তুতি আছে সেই বিষয়টি ওই প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি সহ-প্রদর্শন করেছিলেন রাজা রামমোহন।

ইয়ং নারি পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপ ত্বা মর্ত্যপ্রেত্যম্।
ধর্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি।।

অর্থ : 'এই পুরোবর্তিনী নারী সহধর্মচারিণী বলে পতির অনুষ্ঠিত যাগাদি কর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি ভোগ করতে চায়। হে মরণশীল মানুষ, এ স্ত্রী ভূলোক থেকে নির্গত হয়ে তোমার কাছে সহমরণের জন্য ও পুরাতন ধর্ম পালনের নিমিত্ত যাচ্ছে। এই সহমরণে গমনশীলা স্ত্রীর জন্মান্তরেও যেন ধন ও পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি প্রাপ্তি হয়।' (অথর্ব, সং, ১৮ কাণ্ড, ৩ অনু, ৩ সূক্ত)।

এখন বোঝাই যাচ্ছে যে শ্রুতিটি সহমরণের প্রশংসা করছে। কিন্তু শ্রুতিটি সহমরণের প্রতি কোনো ইতিকর্তব্যতা বিধান করছে না। অর্থাৎ মৃত স্বামীর চিতায় উঠে স্ত্রীকে আত্মত্যাগ করতেই হবে তা কখনোই এই শ্রুতি দ্বারা বোধিত হচ্ছে না। বস্তুত, বহু শ্রুতির অর্থ আক্ষরিকভাবে বোঝাও যায় না। বেদার্থ নিরূপণের জন্য একাধিক সহকারী বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক হয়। তার মধ্যে একটি হলো অর্থবাদ। অর্থবাদ বলতে প্রশংসা বোঝায়। যেখানে শ্রুতিতে এই অর্থবাদের প্রয়োগ হয় সেখানে কখনোই শ্রুতির আক্ষরিক অর্থের গ্রহণ হয় না। বর্তমানস্থলেও তাই হয়েছে। অন্যদিকে, এর ঠিক পরবর্তী শ্রুতিতেই পুত্রবতী বিধবার স্বামীর সহমরণে নিষিদ্ধতা বিহিত হয়েছে। শ্রুতিটি হলো :

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গত্যসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রভসং দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূথ।।

(ঋগ্বেদ ১০।১৮।৮)

অর্থ : হে ধর্মপত্নী, এ জীবলোকের উদ্দেশ্যে মৃত পতির কাছ থেকে তুমি উঠে এসো। যে মৃত পতির সঙ্গে শয়ন করেছ, সেখানে দৃষ্ট প্রয়োজনের অভাবেই তার কাছ থেকে চলে এসো। তোমার পাণিগ্রহণকর্তা অপত্যরূপেই তো জন্মলাভ করেছেন।

ওই শ্রুতিতে স্পষ্টত সহমরণের প্রতি নিষেধবাক্যই প্রযুক্ত হয়েছে। নিয়ম আছে, দুটি বিরোধী বিধির মধ্যে যেটি শেষে বলা হয় তাই গ্রহণীয় এবং একই বিষয়ের উপর আধারিত একটি কর্তব্যসূচক বাক্য ও নিষেধবাক্যের মধ্যে নিষেধবিধিই পালনীয়। সুতরাং বৈদিক বিধির দ্বারাই এটা সিদ্ধ হয় যে সহমরণ প্রথা ত্যাজ্য। রাজা রামমোহন ওই নিবন্ধে এই বৈদিক যুক্তিই প্রদর্শন করেছিলেন মাত্র। তিনি আধুনিককালের উচ্ছেদবাদীর মতো নতুন কোনো নিজস্ব যুক্তির অবতারণা করে বেদনিন্দা করেননি। যদি প্রকৃতার্থে নবজাগরণের অর্থ হয় পুরাতনের নবীনরূপে জাগরণ, তবে অবশ্যই বলা যায় শ্রুত্যনুসারিণী যুক্তির মাধ্যমে প্রাচীন বদ্ধ কুপ্রথার প্রাচীরভঙ্গ করে রাজা রামমোহন সেই কাজ সুসম্পন্ন করেছিলেন।

একথা আগেই আমরা বলেছি যে, রাজা রামমোহন রায় প্রণীত নব্যধারার অধ্যাত্মমার্গে পাশ্চাত্য মতের প্রভাব ছিল। বস্তুত, পাশ্চাত্যের একেশ্বরবাদী সগুণ অথচ নিরাকার ঈশ্বরচেতনার দর্শন দ্বারা ঋদ্ধ হয়েছিল তাঁর মনন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, রাজার এই মনন কি হিন্দু ভাবধারার বৈরী? এর উত্তরে আমরা বলব, গভীর ব্যাপক এই হিন্দুদর্শনের জঠরে পৃথিবীর সকল ধর্ম, দর্শন ও ভাবেরও সংকুলান হতে পারে। গান্ধীজী বলেছিলেন, 'The beauty of Hinduism lies in its all-embracing inclusiveness.' গান্ধীজীর উক্তিটি একাংশও মিথ্যা নয়। শ্রুতিতে যেমন নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদন হয়েছে, তেমনই শ্রুতিতে সগুণ নির্বিকার ব্রহ্মও প্রতিপাদ্য হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশিষ্টাদ্বৈত পরম্পরার আচার্য রামানুজ যে সগুণ অশেষকল্যাণগুণকর সবিশেষ চৈতন্যের ভাবনা উপস্থাপন করেছেন, সেই ব্রহ্মও কিন্তু সজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত নির্বিকার

চৈতন্যবিশিষ্ট। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রামায়ণের একটি অপূর্ব শ্লোক, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে প্রশ্ন করেছেন যে, আমি তোমার কে? উত্তরে হনুমান বলছেন,

দেহবুদ্ধ্যা তু দাসোঽহং জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকম্।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।।

অর্থ : দেহবুদ্ধিতে যখন আমি তোমায় দেখি তখন আমি তোমার দাস, জীববুদ্ধিতে দেখলে আমি তোমার অংশ, আর আত্মবুদ্ধিতে দেখলে আমিই তুমি হয়ে যাই (হনুমচ্চরিত্র ঝটিকা)।

একটি শ্লোকেই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত— তিনটি দর্শনই ধরা আছে। দর্শনের সকল প্রধান প্রধান বিরোধী ভাবই একই সনাতন ধর্মের দেহে লীন। ফলে এখন সুধী পাঠকই বিচার করবেন, রাজা রামমোহন প্রণীত ধর্ম কি সনাতন ধর্মের থেকে সত্যই ভিন্ন কোনো মতবাদ?

তবে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, রাজা রামমোহন খ্রিস্টমতের দ্বারা কেন প্রভাবিত হলেন? এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য হলো, এই সময়ে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সন্ধিক্ষণ হচ্ছে, দুটো ভিন্ন সংস্কৃতি পরস্পর মিশছে, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁর মতাদর্শে খ্রিস্টপ্রভাব থাকা কিছুমাত্র অন্যায্য নয়। এছাড়া, তাঁর প্রকল্পিত ধর্মে সগুণ নিরাকার ঈশ্বর কল্পনার অন্য একটি কারণও ছিল। খ্রিস্টমতের সগুণ নির্বিশেষে ঈশ্বরের ধারণার অনুরূপ আদর্শ যে হিন্দুর ধর্মেও বিদ্যমান তার প্রকাশ সাধারণ জনমানসে প্রচার না করলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের দলে দলে খ্রিস্টান হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল ছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রাজা রামমোহনের ধর্মবোধ কখনোই খ্রিস্টমতের সকল কিছুকে গ্রহণ করেনি। খ্রিস্টানদের মত প্রচারের দুরভিসন্ধির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ' উল্লেখযোগ্য। তিনি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রবন্ধে সেকালের খ্রিস্টানদের ধর্মান্তর করার তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করে বলেছেন,

'প্রথম প্রকার এই যে নানা প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের নিন্দা ও হিন্দু দেবতা ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপন ধর্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের মতের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ দেওয়া। তৃতীয় প্রকার এই যে, কোনো নীচলোক ধনাশায় কিংবা অন্য কোনো কারণে খ্রিস্টান হয় তাহাদিগকে কর্ম দেওয়া ও প্রতিপালন করা যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে (রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ খ্রি. 'ব্রাহ্মণ সেবধি', পৃষ্ঠা-২৩৩)।

রামমোহন ধর্মান্তর না করে হিন্দুর সঙ্গে ভাবনায় যোগদান করার আহ্বান করেছিলেন খ্রিস্টানদের। তিনি বলেন, কিন্তু বঙ্গদেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নামমাত্র লোকে ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল, দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের মতের উপর দৌরাত্ম্য করা কী ধর্মত কী লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা দুর্বলের মনঃপীড়াতে সর্বদা সংকুচিত হন। তাহাতে যদি সেই দুর্বল তাহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্মান্তিক কোনোমতে অন্তঃকরণেও করেন না।...যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্মসংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচার-সহ হয় না, তবে বিচারবলে হিন্দুর ধর্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন। সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম গ্রহণ করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ক্ষুদ্রগৃহে নিবাস ও শাকাদিভোজন ও ভিক্ষোপজীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হন, যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে (রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ খ্রি. 'ব্রাহ্মণ সেবধি', পৃষ্ঠা-২৩৩-২৩৪)।

এর অনতিবিলম্বেই তিনি জাতীয় পতনের দুটি কারণ নির্দেশ করে বলেছেন কেন আমরা বারবার শতাব্দীর পর শতাব্দী পরাধীন, অত্যাচারিত ও ধর্মীয়ভাবে নিগৃহীত হয়েছি। তিনি বলেছেন,

'এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসাত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয় (রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ খ্রি. 'ব্রাহ্মণ সেবধি', পৃষ্ঠা-২৩৩)। তাঁর এই কথা মনুসংহিতার সেই বাণীরই প্রতিফলন যেখানে বলা হয়েছে— 'অহিংসা পরম ধর্ম ধর্মহিংসা তথৈবচ।'

বস্তুত, অন্যের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলার আগে আমাদের নিজেদের দিকেও কিন্তু আঙুল ওঠে। জাতিভেদ প্রথা আমাদের সেই দুর্বলতার স্থান। এই প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র বলেছেন,

The distinction of castes introducing innumerable division and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise. (রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩ খ্রি. 'ভূমিকা', পৃষ্ঠা-২১)।

এই কারণে তিনি মৃত্যুঞ্জয়াচার্যের বজ্রসূচী গ্রন্থের অনুবাদ করে দেখিয়েছেন যে, জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণত্বের নিরূপণ নয়, কর্মই ব্রাহ্মণত্বের নিয়ামক হয়ে থাকে। যদিও সকল বিষয়েই যে তাঁর বিচার আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় এমন নয়, কিন্তু জাতির উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত তাঁর ভাবনাগুলির পরিচয় পেতে গেলে তাঁর চিন্তনাবগাহী প্রবন্ধগুলির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

রাজা রামমোহন রায় আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে ধর্মান্তরের মতো যে সামাজিক সমস্যাগুলির উল্লেখ ও সমাধানের পথ আমাদের প্রদর্শন করেছিলেন, আজকের ভারতে সেই সমস্যাগুলি এখনও অধিকতর তীব্রভাবে জাজ্বল্যমান। সেই সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমাদের মতো দীপ্ত মানবকদের আজকের দিনে চোখ খুলবে কি? □

কুমোর যুধিষ্ঠির

এক ছিল কুমোর। তার নাম যুধিষ্ঠির। সংসারে তার আপন বলতে কেউ ছিল না। মনের সুখে চাক ঘুরিয়ে মাটির হাঁড়ি, কলসী, মালসা, থালা এইসব বানাত আর হাটে হাটে সেসব বিক্রি করে পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরত।

একদিন হাটের কেনা-বেচা শেষ করে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। আকাশ মেঘলা থাকায় খুব অন্ধকার ছিল। গাঁয়ের পথে কুকুরের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে নিজেরই বাড়ির উঠোনের কোনে ভাঙা খুপড়ির ওপর পড়ে গিয়ে কপাল কেটে একেবারে রক্তারক্তি। বেশ কদিন ভুগতে হলো কপালের ঘা নিয়ে। শেষে ঘা সারল বটে, তবে কপাল জুড়ে একটা গভীর দাগ চিরকালের জন্য রয়ে গেল।

কুমোর যুধিষ্ঠিরের দিন কেটে যায়। একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। না খেতে পেয়ে মানুষ মরতে লাগল। সেও অনেকের সঙ্গে রাজ্য ছেড়ে পাড়ি দিল অন্য রাজ্যে। নতুন রাজ্যে এসে তার খুব ভালো লাগল। এখানে অভাব নেই, মানুষজন হাসি খুশি। দোকানি কত রকম পসরা সাজিয়ে বসে আছে। সে ভাবল, বাঃ, এলাম যখন, এই চমৎকার রাজ্যে থেকে যাই না কেন!

কিন্তু এখানেও তো কিছু কাজ করতে হবে। না হলে কী খাবে? এই ভেবে একদিন সে ওই রাজ্যের রাজসভায় গিয়ে হাজির হলো। রাজদরবারে পাত্রমিত্র নিয়ে সিংহাসনে বসে আছেন রাজা। পাশে রয়েছে দুই রাজপুত্র। তারা মন দিয়ে রাজকার্য শিখছে। কিন্তু রাজার মুখ বড়োই মলিন ও চিন্তিত। কেননা কয়েকদিন আগেই রাজ্যের সেনাপতি মারা গেছেন।

যুধিষ্ঠির এসে দাঁড়াল রাজার সামনে। কুমোরের ঘরের ছেলে হলে কী হবে, তার যেমন স্বাস্থ্য, তেমনই বলিষ্ঠ চেহারা। রাজামশাই তার দিকে তাকাতেই প্রথমে নজর পড়ল তার কপালের গভীর দাগটার উপরে। রাজা মনে মনে ভাবলেন, এ নিশ্চয় কোনো ছদ্মবেশী রাজপুত্র। রণাঙ্গণে যুদ্ধ করেতে গিয়ে কপালে অস্ত্রের আঘাত লেগেছে। এ বীরপুরুষ না হয়ে যায় না। মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করে রাজামশাই বললেন, তোমার উপযুক্ত কাজই তুমি পাবে। আজ থেকে তুমি এই রাজ্যের ছোটো সেনাপতির পদে বহাল হলে। অবাক হয়ে যুধিষ্ঠির তাকিয়ে রইল মহারাজের দিকে। তারপর সামলে নিয়ে বলল, তাই হবে মহারাজ।

অচেনা একজনকে সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়ায় পাত্রমিত্র, মন্ত্রী সবাই অবাক হয়ে গেল। দুই রাজপুত্রেরও ব্যাপারটা ভালো লাগল না। কিন্তু রাজার মুখের উপর কেউ কোনো কথা বলেতে সাহস করল না।

যুধিষ্ঠির ছিল কুমোর। কিন্তু ভিন রাজ্যে এসে বরাত জোরে হলো রাজ্যের ছোটো সেনাপতি। এখন তার সাজানো গোছানো বড়ো বাড়ি। দাস দাসী, ঠাকুর চাকর এসব নিয়ে এলাহি ব্যাপার। পরনে সেনাপতির পোশাক, মাথায় পাগড়ি, কোমরে তলোয়ার। প্রতিদিন সে বীরের মতো এসে রাজসভায় বসে। মাস গেলে মোটা টাকা মাইনে পায় আর রাজার কাছেও খুব খাতির যত্ন পায়। এমনি করে তার সুখে দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন শত্রু হানা দিল রাজ্যে। তখন রাজ্যে হইহই কাণ্ড। অস্ত্রশস্ত্রে শান দিয়ে সৈন্যদল তৈরি হতে লাগল।

মহারাজ তখন যুধিষ্ঠিরকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, কোন যুদ্ধে গিয়ে তোমার কপালে এত বড়ো আঘাত লাগল। যুধিষ্ঠির তখন ভয়ে ভয়ে বলল, রাজামশাই, ওটা কোনো অস্ত্রের চোট নয়। আমি এক সামান্য কুমোর। কুকুরের তাড়া খেয়ে পালানোর সময় পড়ে গিয়ে কাটার দাগ।

শুনে রাজামশাই একেবারে থ। লজ্জার তার মাথা হেঁট হয়ে গেল। একটু চুপ করে তেকে বললেন, আমার ভুল। না জেনে তোমাকে নিয়োগ করেছি। তুমি এক্ষনি আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাও।

কুমোর যুধিষ্ঠির সেদিনই রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

গোরুমারা

জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত গোরুমারা জাতীয় উদ্যান। এই বনভূমির আয়তন ১৩০০ বর্গকিলোমিটার। তিস্তা, তোর্ষা, মালঙ্গী, জলঢাকা, রায়ডাক, সঙ্কোষ, মূর্তি, কালজানি প্রভৃতি নদী এই বনভূমির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। ১৯৭৬ সালে এটি জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা পায়। এই উদ্যানে পাঁচটি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে। এগুলি হলো— মেদলা,চাপড়ামারি, যাত্রাপ্রসাদ রাইনো পয়েন্ট, চুকচুকি ও খুনিয়া। লাটাগুড়ি শহর এই জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ পথ। উদ্যানটি মূলত ভারতীয় গণ্ডার প্রজনন ও পালনের জন্য বিখ্যাত। এখানে ৫০ প্রজাতির জন্তুজানোয়ার, ১৯৪ প্রজাতির পাখি, ২২ প্রজাতির সরীসৃপ, ৭ প্রজাতির কচ্ছপ, ২২ প্রজাতির মাছ এবং ছোটো বড়ো বহু প্রাণী রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৩৮

एकवचनम- बहुवचनम (पुंलिङ्गे)

बालकः- बालकाः ।

(একজন বালক। অনেক বালক।)

छात्रः-छात्राः ।

(একজন ছাত্র। অনেক ছাত্র।)

अभ्यासं कुर्मः-१

पुरुषः -पुरुषाः । लेखकः - लेखकाः ।

पण्डितः -पण्डिताः । सेवकः सेवकाः ।

भक्तः -भक्ताः । शुनकः -शुनकाः ।

मार्जारः -मार्जाराः । सुधाखण्डः -सुधाखण्डाः

प्रयोगं कुर्मः -

देशः,ग्रामः,सन्तानः, वृक्षः, शृगालः, दुष्टः, राक्षसः, ब्राह्मणः,वैद्यः, तण्डुलः, प्राणः,आसन्द, वित्तकाषः ।

ভালো কথা

হনুমানের দয়া

আমাদের ব্যারেজ কলোনিতে মাঝে মাঝে হনুমানের দল আসে। কয়েকদিন থাকে আবার চলে যায়। সকালে, দুপুরে ঠিক খাবার সময় ওরা আসে। মুড়ি, ভাত, রুটি কিছু একটু দিলেই খেয়ে নিয়ে চলে যায়। কোনো উপদ্রব করে না। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি একটা শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে পুকুরে গড়িয়ে পড়ে গেল। আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম কী করব। শুধু চিৎকার করেছিলাম। লোকজন ছুটে আসার আগেই একটা বড়ো হনুমান গাছ থেকে লাফিয়ে জলে পড়ে শিশুটিকে তুলে আনল। ওর মা দৌড়ে যেতেই শিশুটিকে মাটিতে রেখে হনুমানটি লাফিয়ে গাছে উঠে পড়ল। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে কোথায় চলে গেল।

স্নেহা চক্রবর্তী, সপ্তম শ্রেণী, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) গু গু খ খ	(১) খা খ চা ই র
(২) ত ত ক্ষ ক্ষ	(২) ছা ছা গা গা লি

৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) পরিবর্তন(২) রদবদল

৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অকূলপাথার (২) অকালবোধন

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) সুপ্রিয় রায়, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি (৩) দীপঙ্কর সাহা, কুকস কম্পাউন্ড, পুরুলিয়া (৪) বিদিশা সাহা, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগণা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

HAR GHAR SIP
SIP is one of the simplest ways to Invest and Create your Wealth.

Start an SIP
Take The First Step to
FINANCIAL FREEDOM!

Mr Debashis Dirghangi CFP®
AMFI REGISTERED MUTUAL FUND DISTRIBUTORS

DRS INVESTMENT

PMS | MUTUAL FUND | INSURENCE | MEDICLAIM | FD | BOND

Website: https://drsinvestment.com
Email.: drsinvestment@gmail.com

Contact @ 9748978406 / 8240685206

ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু নবজাগরণের পুরোধাপুরুষরা

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ মিলেই মানবজাতি। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে তিনটি ধারা রয়েছে। জীবনধারা, বোধধারা এবং সাংস্কৃতিক ধারা। এই তিন ধারার মধ্য দিয়েই যে কোনো জাতি পৃথিবীর মানবধারায় নিজ যথাযথ আসন লাভ করে।

সেকুলার ইতিহাসবিদরা ৭১২ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস পড়াতে চান না। যে সভ্যতা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও বিস্ময়কর ছিল। পৃথিবীর গবেষকরা যার গুণবত্তায় মোহিত হন। সেটাই ভারতবর্ষের জাতিগত উত্তরাধিকার। যার জন্য পৃথিবীর সব থেকে ভিন্ন; সে বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে একটা ভূখণ্ডই পড়ে থাকবে, জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধবে না। এখন দেখার নেই জাতিসত্তাটি কী? ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাদের প্রাণের স্পর্শে এবং কর্মকাণ্ডে তার পুনর্জাগরণ ঘটেছিল।

কোনো ভণিতা না করে বলা যায় তার মূল সুর হলো 'হিন্দুত্ব' বা সনাতন ধর্ম। 'হিন্দু' শব্দের অর্থটিও জানা জরুরি। 'হিন্দুত্ব' ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক পরিণতি, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়— 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী! ভারতবর্ষ।' সত্যিই তো, টেথিস সাগরের তলা থেকে উঠে আসা এই হিমালয়ের প্রকৃতি, সভ্যতা সারা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। প্রকৃতি মানব মননের সূক্ষ্মতম বিকাশের পরিমণ্ডল যেন মনোহর পুষ্পপল্লবে সাজিয়ে রেখেছিল।

সেই সুরধারা হিন্দু, হিন্দুত্ব তথা সনাতন সংস্কৃতি যা ভারতীয় ধারাতেই, নবজাগরণের অগ্রদূতদের আবির্ভাবে তাঁদের জীবন, সংস্কৃতি মন্থনে নবজাগরণের বিশিষ্টতা লাভ করেছে। তারই কিছু ভাবনা এই নিবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ যাঁকে ভারতপথিক বলেছেন, তিনি— রাজা রামমোহন রায়। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা; তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র আলোচনা জগতের অগ্রদূত; নারী জাগরণের জনক; সমাজ ও ধর্মসংস্কারক, 'জনজাগরণ'-এর সাংবাদিক, ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এবং সংগ্রামীব্যক্তিত্ব। রামমোহনের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি আরামবাগের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে। বাংলা, সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে ফার্সিও শেখেন সে সময়ে। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পাঠ নেন বাইশ বছর বয়সে।

ভাদ্র ১৭৬৪ শক ৩য় সংখ্যায় বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে--- 'তিনি রীত্যনুসারে বঙ্গ ভাষায় উপদেশ প্রাপ্ত হইলে আপন পিতার অভিলাষ এবং পিতৃব্যাদির কৌশল দ্বারা পারস্বভাষা অভ্যাস করণের নিমিত্তে পাটনায় স্থাপিত হয়েন। আর মাতামহ বংশের ইচ্ছানুক্রমে সংস্কৃত ও হিন্দুধর্ম শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করতে তাঁকে বারাণসীতে পাঠানো হয়'।

তাঁর আত্মকথায় নিজেই লিখেছেন, agreeably to the message of my maternal relations, I devoted myself to the study of the Sanskrit and theological works written in it, which contain the body of Hindu literature, law and religion. পড়া শেষে হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্তিপূজা ও নিয়ম নিষ্ঠা-সহ নানা সংস্কার নিয়ে লিখতে শুরু করলেন। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বাবা রামকান্তের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে শুরু হয় যত বিরোধ। মা-ও ছেলের এই ধরনের লেখালেখি পছন্দ করলেন না। মায়ের সঙ্গে বিরোধিতা হলেও বৃদ্ধ বয়সে তিনি রামমোহনের কাজে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ২৪ বছর বয়সে দুঃসাহসে ভর করে স্বধর্মের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন প্রকাশ্যে। সেই সঙ্গে মানুষের মধ্যে থাকা কুপ্রথাগুলিও দূর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্যবিধবা পত্নীর

সহমরণ যাত্রার মাধ্যমে বধূকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রবণতা তাঁর অন্তরকে আন্দোলিত করেছিল। পিতৃদেবের জীবদ্দশাতেই তিনি প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে সমাজের ব্রাহ্মণদের চোখরাঙানি, সাধারণ মানুষের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা অতিক্রম করতে হয়েছিল।

বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলাপ আলোচনা করার জন্য কোনো সভা বা সমিতি করার প্রচলন সে যুগে ছিল না। ১৮১৫ সালে সাধারণ মানুষের জন্য সামাজিক মোড়কে আত্মীয় সভা গড়ে তুললেন। এই সভার বৈশিষ্ট্য ছিল বাক্‌স্বাধীনতা আর বিষয়বস্তু হিসেবে সামাজিক কুপ্রথা নিবারণ। যেমন বাল্যবিবাহ, সহমরণ বা সতীদাহ কিংবা পুরুষদের বিশেষত কুলীনদের বহুবিবাহ করার প্রবণতা ইত্যাদি। স্পর্শকাতর বিষয়গুলির সমাধানের জন্য আলোচনা হতো। ১৮১৯ সালের ২২ মে সমাচার দর্পণে 'আত্মীয়সভা' শিরোনামে 'বেদান্তমত' উপনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই সভার একটি বিবরণ পাওয়া যায়।

জন্মভূমি এবং নিজের দেশের প্রতি অকৃত্রিম ও আন্তরিক ভালোবাসা তাঁর মৌলিক ও স্বতন্ত্র মঙ্গলসাধন প্রণালীর দ্বারা বাস্তবায়িত হতো। এই প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্যায়নটি এরকম— ''আমাদের দেশের সেই পবিত্র, নির্মল, বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস যে উপনিষদ শাস্ত্র তাহা সরস্বতী নদীর ন্যায় প্রায় অন্তর্হিত হইবার জো হইয়াছিল তিনি তাহাকে বহু যত্নে উদ্ধার করিলেন— ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা কেবল নহে— স্বদেশের প্রতি কী যে আন্তরিক তাহা দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে।''

রামমোহন উপনিষদাদি বেদান্ত শাস্ত্রসমূহ অনুসরণ করে সেই শাস্ত্রসমূহকে সাধারণের কাছে উদ্ভাসিত করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মমতের মাধ্যমে নবজাগরণের উন্মেষ হলো বঙ্গদেশে। এ প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন বলেছেন— ''তিনি একটি প্রণালী হইয়া এই কার্য সম্পন্ন করিলেন। লোকে বলে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক। ঈশ্বর বিধান করেন। মানুষকে সেই বিধানের বাহক করেন। বঙ্গদেশে তিনি রামমোহনকে পাঠাইলেন।''

সতীদাহ অশাস্ত্রীয় এবং নীতিশাস্ত্রের পরিপন্থী প্রমাণ করে লিখলেন প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ। ১৮২৯ সালে বড়লাট বেন্টিঙ্কের আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটান।

ব্রাহ্মসমাজের কঠিন সংকটের সময়ে তিনি বিলাতে যেতে বাধ্য হন। ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে তিনি হিন্দুধর্মকে আচার সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য মূলত তাঁর বিদ্রোহ হলো বাহ্য আচার, বাহ্য অনুষ্ঠান, বাহ্য ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুষ্ঠান, বাহ্য পৌত্তলিকতা ও প্রথাপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে অর্থাৎ লোকচিত্তকে ধর্মক্ষেত্রে বহির্মুখী না করে অন্তর্মুখী করা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮৭৬ সালে ৬২৪ সংখ্যায় রামমোহনের উপর একটি প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়, 'ইউরোপীয় জ্ঞানালোকে আলোকিত, প্রভূত মনীষাসম্পন্ন একটি হিন্দু হৃদয়ের আবশ্যক হইয়াছিল। এই অবসরে রামমোহন রায় আবির্ভূত হইলেন। হিন্দুধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি; মুসলমান, খ্রিস্টান শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান; তাহার উপর তাঁহার আশ্চর্য তর্কশক্তি। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের গভীরতম প্রদেশে অবগাহন করিয়া রত্ন উদ্ধার করিলেন। বেদ-উপনিষদের গম্ভীর ধ্বনিতে সকলে সচকিত হইল। তিনি ঠিক বুঝিলেন যে বেদ-উপনিষদ ভিন্ন আর কিছুতেই শিক্ষিত সমাজকে— নাস্তিকতা ও পৌত্তলিকতা হইতে রক্ষা করিবার উপায় নাই।'' লক্ষণীয় বিষয় হলো, তিনি নিজেকে হিন্দু বলে আদালতে শপথ গ্রহণ করেছিলেন— When asserting his right for his paternal estates contested in a suit in the Supreme Court of Calcutta, Ram Mohan professed himself to be a Hindu. (Indian Mirror, ১৮১৪ শকাব্দ কার্তিক ৫১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ)

বিদ্যাসাগর অনুরূপ--- ব্যক্তিত্ব পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ। তাঁর বিচিত্র জীবন কথা, অসাধারণ মেধা, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও ইংরেজি ভাষাতে অদ্ভুত কুশলতা। তাঁর এডুকেশন রিপোর্টগুলি যে কোনো ব্রিটিশের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করত।

শিক্ষা সম্প্রসারণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার ও তাঁর ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ধর্মীয় আচার-বিচারের প্রতি তাঁর বড়ো একটা আসক্তি ছিল না। তিনি মানতেন মানবধর্ম। যা হিন্দুত্ব বিপ্লবের বড়ো দিক। মানবতাই তাঁর জীবনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস। বাঙ্গালি জাতিকে মানবপ্রেমে দীক্ষা দিয়ে গেছেন। প্রেমের সঙ্গে বীর্যের, আবেগের সঙ্গে পৌরুষের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের এক আশ্চর্য মিলনের মধ্যে।

রামমোহন মন ও বুদ্ধিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে জাতির মূঢ়তার চটকি ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর এই হতভাগ্য জাতির চরিত্রে প্রেম ও পৌরুষকে জাগাতে চেয়েছিলেন।

অলস সাহিত্য চর্চা এই কর্মযোগী মহাপুরুষের আদৌ রুচিকর ছিল না। তিনি Art for Art's Sake নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। জনকল্যাণ সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য, তাঁর মতো জনহিতব্রতীর এরকম অভিলাষ থাকাই সম্ভব।

তিনি Pragmatic ছিলেন। বস্তুর উপযোগ দিয়ে বস্তুর মূল্য বিচার ব্যবহারিতাই জগতের বস্তু ব্যাপার ও জ্ঞান ব্যাপারের একমাত্র নিদান। উপযোগবাদের ভক্ত। ঈশ্বরচন্দ্র তাই মনে করতেন। তিনি মনে করতেন নিছক সাহিত্য সৃষ্টির চেয়ে লোকহিত-সাধনে সাহিত্যের ব্যবহার সমস্ত শিল্পচেতনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শিক্ষা সংস্কারে মনোনিবেশ করতে গিয়েই দেখলেন ভাষা ও ভাবের অভাব। বর্ণপরিচয়ের জনক ভাষার প্রতি মৌলিক পুস্তক, সঙ্গে অনুবাদ সাহিত্যের দিকেও নজর দিলেন। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে বাসুদেবচরিত লিখলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১ম ও ২য় খণ্ড লিখলেন। ছদ্মনামে খানকয়েক পুস্তিকা লেখেন। সরল ও ব্যঙ্গের ভাষায় প্রতিবাদীর হাস্যকর অভিমত ছিন্ন ভিন্ন করে বিতর্কমূলক রচনায় স্বাদু ও লঘু রসের স্পর্শ দিয়েছিলেন। বাংলাগদ্যের কায়ানির্মাণের শ্রী ও হ্রী বিদ্যাসাগরের দান। বর্ণপরিচয়ে শিশু মনে প্রভাবের ক্ষেত্রে নীতি শিক্ষাগুলি এক একটি ছোটো গল্প ও তাঁর

মৌলিক দৃষ্টান্ত। আধুনিককালে গদ্যের অনেক বৈচিত্র্য দেখা গেলেও পদান্বয় ও যতিবন্ধনের ক্ষেত্রে তাঁকে ছাড়িয়ে কোনো পথ আবিষ্কার হয়নি।

সমাজসেবী বিদ্যাসাগরের অন্যরূপ তিনি করুণাসাগর। তিনি উপনিষদের প্রথমপাঠ ভোলেননি। মাতৃদেব ভব, পিতৃদেব ভব ইত্যাদি। 'মা' তাঁর কাছে ঈশ্বর। তাদের ইচ্ছা— তা অবৈতনিক বিদ্যালয় বা গ্রামের মানুষের কম্বল বিতরণ যাই হোক না কেন। সবটাই তিনি ছিলেন আন্তরিক। বহু ঘটনা আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। ভুবনের কাছে মাসির ভূমিকা ঠিক না থাকায় তাঁর ভয়ংকর জীবনের পরিণতি আজকেও গভীর শিক্ষার বিষয়। সামাজিক বিপ্লবের মস্ত বড়ো হাতিয়ার।

সেবাতেও তিনি অনন্যসাধারণ। গ্রামগঞ্জের মানুষের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে ব্যাধি এবং তার উপশমের জন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মনোযোগ দেন। ১৮৭৭ সালে চিকিৎসার কাজ শুরু করেন। জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত তা পরিহার করেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর পৌত্র ও প্রপৌত্র এই চিকিৎসা ও গবেষণার মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কবির ভাষা দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, 'সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয় তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়'।

এক ঈশ্বর, ভিন্ন ভিন্ন নাম। 'হিন্দু' মনুষ্যত্ব-মানবতার এক নাম। হিন্দুধর্ম নামক রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন— হিন্দুধর্ম বা জাতীয়ধর্মের পুনর্জীবন ছাড়া ভারতবর্ষের মঙ্গল সম্ভব নয়। যাতে মানুষের যথার্থ উন্নতি ও বিকাশ ঘটে, তা শারীরিক মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সর্বাধিক উন্নতি হয়, তাই ধর্ম। এইরূপ কথা ও তত্ত্ব নিয়ে সকল ধর্মের সার ভাগ-গঠিত।। এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায় এই উন্নতিকর তত্ত্ব সকল ধর্মাপেক্ষা সনাতন হিন্দু ধর্মেই প্রবল। তার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। সেটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে— শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক— তাহা অধর্ম। যাহা ধর্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে বা বেদে থাকে তবু অসত্য অধর্ম বলিয়া পরিহার্য। —একথা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করে তাঁর অভিমত ব্যক্তি করেছেন। তা আজকেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বটেই এবং এটাই চিরন্তন।

বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের সমুদয় শক্তিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। ১. শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জনী, (৩) কার্যকারিণী, ৪. চিত্তরঞ্জিনী।

প্রথমে শারীর বৃত্তিগুলির অনুশীলন। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন বৃত্তির অনুশীলন, কার্যকারিণী বৃত্তি তথা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন এবং আনন্দকে উপলব্ধি করা যায় চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনে। নিত্য নৈমিত্তিক অনুশীলনের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব তথা হিন্দুত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের সঙ্গে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন। জ্ঞানার্জন হলেই মানুষ হয়ে উঠবে তার কোনো নিশ্চয় নেই। আজকের দিনে দেখছি বা ইউরোপীয় শিক্ষার মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে, মানুষ অর্থগৃধ্নু স্বার্থপর, যুদ্ধপ্রিয়, হীন মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে উঠছে। এর জন্য কার্যকারিণী বৃত্তি বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি অনুশীলনের মাধ্যমে সামঞ্জস্য গড়ে উঠবে। তখনই হবে যথার্থ মঙ্গল। তখন শক্তিমত্তায় হবে কার্ত্তিকেয়, বুদ্ধিতে হবে বৃহস্পতি, জ্ঞানে ব্রহ্মা এবং সর্বাঙ্গীণ পরিণতি বিশিষ্ট ষড়ৈশ্বর্যশালী বিষ্ণুর প্রাধান্য লাভ করবে। এর মধ্যে দিয়ে সাহিত্যকর্ম, কবির কবিতা, বিজ্ঞান, ধর্মোপদেশ তথা মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটবে। সেটাই শিক্ষার প্রকৃত কাম্য। এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তি - পরিবার - সমাজ - দেশ - পৃথিবী ক্রমবিকাশ ঘটবে। এই জাতিতত্ত্বের মধ্য দিয়ে হিন্দু নবজাগরণের কথা বলেছেন বন্দেমাতরম্ উদ্‌গতা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম।

হিন্দু নবজাগরণের আরেক মুগ্ধতা, অপার বিস্ময় হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অনন্ত ভালোবাসার ব্যঞ্জনাময় অপূর্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভরা একটি বিশ্বমানের হৃদয়। এমন অসাধারণ সৎ, সাহস, প্রেম, ক্ষমা তেজস্বিতার বাণী বাহক মহৎ চরিত্র ভারতবর্ষ দেখেনি। যার সবটাই ইতিবাচক কোনো নেতিবাচক নেই। এই মহৎ প্রাণ সুহৃদ সর্বদাই চাইতেন এক অনন্য মানব জীবনের মধ্যে বিপ্লব, সনাতন জীবনের পুনর্জাগরণ। হিন্দুত্বের সাংস্কৃতিক বিপ্লব। যার মূল কথাই হলো মানুষ ভালো খাবে, ভালো পরবে, মানুষের মতো মানুষ হবে। দৈনন্দিন জীবনে বাইরের সম্পদ আহরণের সঙ্গে সঙ্গে মনের সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করবে। সর্বাঙ্গসুন্দর হবে মানুষের জীবন। মানুষরূপী দেবতাদের অন্তর্নিহিত সমস্ত প্রতিভার হবে যথার্থ স্ফুরণ। এর জন্য প্রয়োজন মানুষে মানুষে অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং উচ্চ মূল্যবোধ নিয়ে পারস্পরিক আদান প্রদান, বোঝাপড়া।

বর্তমানে জাতির আত্মশক্তির অবলুপ্তি ঘটেছে। মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আজ চারদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রোগে, শোকে পরিপূর্ণ। সমাজের একদিক ধনীদের বিলাসবহুল জীবন, অন্যদিকে জীর্ণশীর্ণ মানুষের হা-অন্ন হা-অন্ন কলরব। ধর্মে কেবল প্রাণহীন আচার- আচরণ।

ভগবান শ্রীচৈতন্য যেমন হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ বলে রোদন করে ভক্তিভাবের চরম উৎকর্ষতা দেখিয়েছিলেন, পরাধীন ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের মতো মানুষ যেন আশা-উদ্যম-আনন্দের পরাকাষ্ঠা। এ কী ভারতবর্ষ দেখছেন তিনি?

স্বামীজী তখন পরিব্রাজক বেশে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে দেখছেন তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে। ঋষির দেশ ভারতবর্ষ। সত্যের দেশ ভারতবর্ষ। ভারতবাসীর শিরায় শিরায় বইছে ব্যাস - বাল্মীকি - শুকদেব - শঙ্করাচার্য - গার্গী - মৈত্রেয়ী - ঘোষা - অপালার রক্ত। যাদের মনের গহনে ঢেউ খেলেছে যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, কর্ণের দানশীলতা, দধীচির আত্মত্যাগ, হনুমানজীর দাস্যভাব— আর আজ কিনা তারা পশুপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঈশ্বর অন্বেষী নিঃস্বার্থ প্রেমিকের অন্তরে বজ্রাঘাত হলো। তাঁর উদ্দাম অশান্ত বৈরাগ্যময় জীবন কেবল মানুষের চিন্তায় ক্রন্দন করতে লাগল। সংসার বিমুখ সন্ন্যাসী লক্ষ লক্ষ পশুপ্রায় মানুষের মাঝে দাঁড়ালেন। সত্য ও প্রেমের তরবারি হাতে। ভারতবর্ষের দিক থেকে বজ্রনিনাদে ঘোষণা করলেন—

ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।

কিন্তু কীসের লক্ষ্য? মানুষ হওয়ার। মানুষকে ভালোবাসার। নিঃস্বার্থ হওয়ার। দুঃখ দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সেবক হওয়ার। কম্বুকণ্ঠে আহ্বান— এস, মানুষ হও।

মনে করা প্রয়োজন যে, আমাদের এই পৃথিবীতে একটি জীবন— অপর বহু জীবনের বেদনা মোচনের জন্য, একটি হৃদয় অপর বহু হৃদয়ের প্রসারের জন্য— ভালোবাসার জন্যই স্পষ্ট হয়েছে। যদি একটি জীবন অপর অসংখ্য জীবনের মঙ্গলের জন্য বলি প্রদত্ত না হয়, যদি একটি হৃদয় অপর অগণিত হৃদয়ের গহ্বরে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি না হয়, তাহলে যুগে যুগে প্রেমিক মানুষের মর্ত্যধামে আগমনের সার্থকতা কোথায়? মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভালোবাসা-ক্ষমার দীপ জ্বালাতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় মহাপুরুষেরা ধরাধামে আসেন। যেমন এসেছিলেন নররূপী জীবন শিব স্বামী বিবেকানন্দ।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বাদেশিকতা ও হিন্দুত্ব নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনি বাঙ্গালি হিন্দু। তাঁর স্বদেশপ্রেম ও হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব প্রাচীন ভারতের হিন্দুত্ব নয়। তিনি বঙ্কিমের মতো বাঙ্গালির দ্বারা সৃষ্ট ও প্রচারিত নব্য বাঙ্গালি হিন্দুত্বের প্রতিমূর্তি। তাঁর 'মাতৃমূর্তি' বলে একটি গান আছে— 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি'— এখানে তিনি স্বদেশ জননীর মূর্তি এঁকেছেন। 'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ/ দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ'— এই দেশমাতৃকার সঙ্গে— 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'— বহু সহস্র বছর ধরে যে মাতার রূপ হিন্দুরা ধ্যান করেছে— সেই মাতা। দেবী চণ্ডী রূপে দেশবাসী তাঁকে দর্শন করে।

রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্বের পরিচয় শান্তিনিকেতনে বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠায়। তিনি শ্রদ্ধানন্দের মতো গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেননি। তাঁর এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ছিল মানুষের সার্বিক বিকাশ যা ছিল আন্তরিক এবং অকপট।

তাঁর স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান এবং তাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সৃষ্টি বা প্রকাশ। সংগীতের মধ্যে জাগরণ তারই ফলশ্রুতি। তাঁর উদার হৃদয়বত্তা যেখানেই স্পর্শ করেছে, ধুলোমুঠি সোনা হয়ে ফিরেছে। তিনি চিরকাল গণ্ডীকে ভেঙেছেন। তাই তিনি নতুন যুগের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ থেকে এসেছিল। গোরার হিন্দুত্ব হিন্দুধর্মের প্রতি আসক্তি নয়, জাতীয়তাবোধের প্রকাশমাত্র। রবীন্দ্রনাথের মনে হিন্দুত্বের প্রাবল্য না থাকলে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিতে পারতেন না। কারণ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালির নব্য হিন্দুত্ব সদর্পে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁর হিন্দুত্ব সম্পূর্ণ মানসিক জাতীয়তা ছিল। সেজন্য নিজের বাণীকে সাধারণ বাঙ্গালির গ্রহণের যোগ্য করে তোলার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ নিতে হয়েছিল। তাঁর হিন্দুত্ব জাতীয়ধর্মী, মূলত ধর্মবিশ্বাস নয়। ভারতবাসীকে ভারতীয় হিসেবেই থাকতে হবে— এটাই ছিল এটাই ছিল হিন্দুত্বের প্রকৃত বাণী। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হলো মনুষ্যত্বের অনুশীলন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের হিন্দুত্বসম্মত মানব ঈশ্বরের কথাই বলেছেন যা পাই তাঁর রচিত 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম মানবিক ব্রহ্ম, তিনি মহামানব— Man the— eternal, Man the Divine.

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে বিশেষত্ব হলো খ্রিস্টমত গ্রহণের প্রবণতা। তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। হিন্দুধর্মীয় নেতারা ধর্মীয় আচার-আচরণকে বেশ কিছুটা সংস্কারিত করেছিলেন।

দ্বিতীয়পর্বে হিন্দুধর্মের সংস্কারের যুগ বা নবজাগরণের যুগ। রামমোহন প্রথম বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হলে হিন্দুধর্মের সংস্কার প্রয়োজন। তিনি বললেন হিন্দুধর্মের মূল কথা হলো— পরম ব্রহ্মে বিশ্বাস ও পরস্পরের প্রতি প্রীতির বন্ধন বা লোকহিত। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন— ধর্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজ সংস্কার কীসের জোরে সম্ভব। রামমোহন ধর্মের সাধনে ব্রতী হয়ে বেদান্তকেই গ্রহণ করেছিলেন। বেদান্তের ধর্ম কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। তার মূল হলো আধ্যাত্মিকতা। বিবেকানন্দ বেদান্তকে সর্বায়ব ধর্মরূপে দেখিয়াছিলেন।

রামমোহনের ধারকে বহন করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মসমাজের ঔপনিষদিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বহু কাজ করেছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তার কারণ অনুভব করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ শুধু উচ্চ শ্রেণীকে কাছে টেনেছিল। সাধারণ মানুষের ধর্ম নিয়ে প্রচেষ্টার সন্ধান হয়নি।

হিন্দু নবজাগরণের যুগে নতুন ধারা গড়ে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবে। নিছক বৌদ্ধিক মনন নয়। ঈশ্বরের প্রতি সহজসরল ভক্তিতেই সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ঈশ্বর অনন্ত ভাবময়। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরের কোনো আকার নেই। তাঁর ঈশ্বর ভক্তিতে কোনো ভাবান্তর ছিল না। ঈশ্বরপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ নারীর গুরুত্বকে বর্জন করেননি। তাঁর সৃষ্টিকর্ম তাই যেখানে স্পর্শ করেছে, সেখানেই এতটা পূর্ণতা পেয়েছে। হয়তো তাঁর জীবনদেবতা নিয়ে গেছেন সেই পূর্ণতার দিকে। এখানে তিনি অনন্য; তিনি রবীন্দ্রনাথ। তিনি কবি এবং সার্বভৌম।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, সনাতন ধর্মই হলো ভারতের জাতীয়তা। অন্যত্র তিনি বলেছেন, ''যে ব্যক্তি আত্মারামকে আবিষ্কার করিতে এবং তাহার মধ্য হইতে পূর্ণরূপে বাস করিতে পারেন, তিনি বিশ্বকে পূর্ণরূপে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া যান, যিনি বিরাট ও স্বতন্ত্র, আত্মারাম ও স্বয়ংপ্রভ; আর তিনি যে জগতে বাস করেন তাহার অধিকারপ্রাপ্ত হইবেন। তাহাকে গঠন করিবার শক্তি লাভ করিতে, তাহার সম্রাট হইয়া দাঁড়াইতে পূর্ণরূপে সক্ষম হন; তিনি আত্মার মধ্যে সকলের সঙ্গে পূর্ণরূপে এক হইয়া যাইতে পারেন। এই পরিণামশীল জীবন আমাদিগকে এই সত্য শিক্ষা দেয়, আর প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রবীণতম রহস্য সকলের মধ্যে ইহা অন্যতম।'' (শ্রীঅরবিন্দ, ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি, পৃষ্ঠা-৪৯২) □

বাঙ্গালির ভাষাপ্রেম

কৌশিক কর্মকার

রাজেশ সরকার

তাপস বর্মন

যে কোনো বিষয় সার্থকভাবে বৃহত্তর পরিসরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি সংগঠিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। একুশে ফেব্রুয়ারি যে জাতিসঙ্ঘ দ্বারা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, তার পিছনেও রয়েছে একটি সুসংগঠিত পরিকল্পিত প্রয়াস। কানাডার ভ্যাঙ্কুভার প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক রফিকুল ইসলাম একুশে ফেব্রুয়ারির 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হয়ে ওঠার জন্য প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ক্রমশ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি দল গঠন করেন; প্রশাসনের সমর্থন লাভ করেন এবং কালক্রমে ইউনেস্কোর মঞ্চে তাঁদের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়ে ইউনেস্কো যে রেজোলিউশন প্রস্তুত করেছিল সেখানে লিখিত হয় 'Recognising the unprecedented sacrifice made by Bangladesh for the cause of mother language on 21 February 1952' এবং 'Proposes that 21 February be proclaimed 'International Mother Language Day' throughout the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this very date on 1952.' রাষ্ট্রপুঞ্জের তদানীন্তন মহাসচিব কোফি আন্নানের স্বাক্ষরিত বিবৃতি জানাচ্ছে : 'The United Nations and UNESCO have long worked to promote the dissemination of mother tongues and to advance multilingual education and linguistic diversity.' অর্থাৎ মাতৃভাষাসমূহের প্রসার, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য। তারপর থেকে প্রতিবছর মহাসমারোহে হয়ে পালিত হয়ে আসছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। কিন্তু প্রদীপের নীচে যে অন্ধকার তার খবর কে রাখে? বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীদের ব্যবহৃত ভাষাগুলি সম্পর্কে বাংলাভাষীদের তুচ্ছার্থক মনোভাব সর্বজনবিদিত।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে বিশেষত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত এই সকল ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস এলাকায় পরিকল্পিতভাবে চলছে মূল ভূমি থেকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যমূলক অভিবাসন; যার একমাত্র লক্ষ্য হলো এসকল ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলিকে সংখ্যালঘু করে তাদের ভাষা সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা। সদ্যপ্রয়াত বিখ্যাত বাংলাদেশি চিন্তক গোলাম মুরশিদ তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের এ সকল ভূমিপুত্ররা তাঁদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ কিংবা সরকারি কাজকর্ম কোনো কিছুই করতে সক্ষম হয় না।

বস্তুত ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে সংঘটিত আন্দোলনটি ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ, সরকারি চাকরিতে সুবিধা লাভের মতো পুরোপুরি কেজো বিষয়কেন্দ্রিক। ইসলামিক সংহতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের নেতারা যখন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা চালান, তখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আসন্ন বিপদ অনুভব করে এই আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর নানাভাবে পূর্ববঙ্গের ভাষাকে মূলধারার বাংলা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। তার মধ্যে দুটি প্রয়াসের কথা এখানে বলা যেতে পারে— ১. আরবি হরফে বাংলা লেখা এবং ২. প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ জোর করে বাংলা ভাষায় নিয়ে আসা। পাকিস্তানের নেতারা আশা করেছিলেন যে, এই দুই উদ্যোগ সফল হলে ধীরে ধীরে পূর্ববঙ্গের ভাষা পশ্চিমবঙ্গের ভাষা থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং কালে কালে পূর্ববঙ্গের লোকেরা আর মূল বাংলা সাহিত্য পড়তে পারবেন না অথবা পড়বেন না। তাদের কাছে এই মূল ধারার বাংলা পুরোপুরি হিন্দুয়ানি অধ্যুষিত, তা হিন্দুর ভাষা; এই চিন্তা বহু আগে থেকেই বিকাশ লাভ করেছে পূর্ববঙ্গের মাটিতে। ১১০২ বঙ্গাব্দে জনৈক আব্দুল ওহাব রচিত একটি পুঁথি ছিল ঠিক এরকম :

হনুদ কোশেশ কৈল হইতে তফাত।।
বাঙ্গালা জবান মধ্যে আনিলেক ছারা।
কোফরী শেরেকী বাত ভরিল তাহারা।।
তা দেখি মোজেজ লোকেরা এছলামের।
ছাড়িল সে ভাষা ভাই ঈমান খাতের।।
এছলামে ঈশ্বর বলা কোফরীর জড়।।
এসব কারণে মোরা ছাড়িনু সে ভাষা।
এলাহি দর্বারে আছে মাফির ভরসা।।

একাত্তরে বাংলাদেশের জন্মের সময় খুব অল্প সময়ের জন্য অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালি জাতীয়তার স্ফূরণ ঘটলেও অচিরেই তার স্থান দখল করে বাংলাদেশি জাতীয়তা। বলাবাহুল্য, এই বাংলাদেশি জাতীয়তা আদতে ইসলামিক জাতীয়তার নামান্তর ছাড়া অন্য কিছু নয়; যে জাতীয়তা বাঙ্গালি পরিচয় নিয়ে রীতিমতো লজ্জিত। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের পরবর্তী সময়ে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। উগ্র ইসলামিক মোল্লাবাদী শক্তি দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে। দাবি উঠেছে হিন্দু কবির লেখা জাতীয় সংগীত প্রত্যাহারের; কারণ তা 'শিরকে ভরপুর'। অথচ মজার বিষয় হলো, পশ্চিমবঙ্গের একটি গোষ্ঠী মনে করে বাংলাদেশিরাই

নাকি বাংলা ভাষার রক্ষক! সত্য হলো বাংলাদেশ যে বাংলাকে রক্ষা করবে, তা 'পাক বাংলা', যে বাংলা গড়ে উঠবে 'পূর্ববঙ্গে মোছলমানের খাছ যবানকে বাংলা ভাষায় স্বীকৃতি'র মধ্য দিয়ে। 'পাক বাংলা'র প্রণেতারা আজকে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাদের স্বরূপ ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে।

অসম রাজ্যের বরাক উপত্যকায় বাংলাভাষী অধিবাসীরা সংখ্যাগুরু ছিল। এই অংশটি মূলত বৃহত্তর শ্রীহট্ট জেলার অংশবিশেষ। দেশভাগের সময়েও অসম প্রদেশের অসমিয়া নেতৃত্ব চাননি শ্রীহট্ট ভারতভুক্ত তথা অসম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হোক। স্বাধীনতা উত্তর সময়েও অসমে বাংলা ভাষা বিরোধী একটি আবহাওয়া চলতে থাকে। 'অসম প্রদেশ বাঙ্গালিদের অধিকারে চলে যাবে'— এহেন প্রচার অসমের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এরই অনিবার্য ফল হিসেবে ১৯৬০ সালে অসমের কংগ্রেস সরকার প্রণয়ন করে 'The Assam Official Language Act, 1960'; যে আইনবলে অসমিয়াকে অসম রাজ্যের 'অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর বিরুদ্ধে অসমের বাঙ্গালি সমাজ একত্রিত হয়ে ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা করে; গঠিত হয় 'নিখিল অসম বাংলা ভাষাভাষী সমিতি', 'ভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর মতো সংগঠনসমূহ। আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ ১৯৬১ সালের ১৩ মে'র মধ্যে বাংলা ভাষাকেও রাজ্যের 'অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ' করার দাবি জানায়। সরকার দাবি না মানলে ১৯ মে তারা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে। শিলচর রেল স্টেশনের কাছে বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালালে এগারোটি তাজা প্রাণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এই আন্দোলনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। মাত্র ষোলো বছর বয়সি ছাত্রী কমলা ভট্টাচার্য-সহ দশ জন মানুষের আত্মত্যাগের কাহিনি আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। ১৯ মে ১৯৬০ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহরু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন অসমে। তিনি জনসভায় ভাষণ দিলেন, ভাষা বলিদানীদের প্রতি কোনো সহানুভূতি তো প্রকাশ করলেনই না, উপরন্তু তাঁদের 'সরকারি সম্পত্তিতে আগুন লাগানোর কারবারি' বলে দোষারোপ করেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গের স্কুল কলেজে একুশে ফেব্রুয়ারি জাঁকজমক-সহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। তবে উনিশে মে বিরাজ করছে ইতিহাসের উপেক্ষিত এক অধ্যায় রূপে। বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন একুশের থেকে কোনো অংশে কম নয়, তা আমরা এখনও অনুধাবন করতে পারিনি। আমরা ইতিহাস বিস্মৃত জাতি, কখনোই ইতিহাস সচেতন ছিলাম না, আজও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও একান্তভাবে বাঙ্গালিরই। ১৯১২-১৯৫৬, দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় জুড়ে পরিচালিত হয়েছিল মানভূমের ভাষা আন্দোলন। মানভূম সদর মহকুমা অঞ্চল ছিল একটি বাংলাভাষী অধ্যুষিত এলাকা। স্বাধীনতার সময়ে মানভূম বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১২ সাল থেকেই ভাষিক আধিপত্যবাদের শিকার হয় মানভূম অঞ্চলের বাংলাভাষীরা; বাংলামাধ্যমে শিক্ষাদান বন্ধ হয়ে আসে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও তাঁরা স্বাধীনতা লাভ করতে অসমর্থ হন। মানভূমে চাকুরিরত বাঙ্গালি আধিকারিকদের বিহারের অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয় ইচ্ছাকৃতভাবে; বাধ্যতামূলক হিন্দি শিক্ষার আদেশ প্রেরিত হয়, বাঙ্গালিদের আবাসিক শংসাপত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। এরই প্রতিবাদে মানভূমের বাঙ্গালিরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধে শামিল হয়। মানভূমের বিশিষ্ট নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে লোক সেবক সঙ্ঘ গড়ে তোলেন; কারণ কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা কোনো প্রতিকার পাননি। পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশের মানুষেরও সমর্থন লাভ করেন এই আন্দোলনকারীরা। পুরুলিয়ার নিজস্ব ঐতিহ্য টুসু গান হয়ে ওঠে তাদের আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার; 'শুন বিহারী ভাই/তোরা রাখতে লারবি ডাঙ দেখাই।/তোর আপন তরে ভেদ বাড়ালি,/বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।' ১৯৫৬ সালে এপ্রিল মাসে মানভূমের পুঞ্চা থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটি দীর্ঘ পদযাত্রার সূচনা ঘটে। তিন শতাধিক কিলোমিটার অতিক্রম করে সত্যাগ্রহীরা সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভাষার অধিকার থেকে কেউ তাঁদের বিচ্যুত করতে পারবে না। ১৯১২ থেকে ১৯৫৬, দীর্ঘ চার দশকের আন্দোলনের শেষে মানভূম অঞ্চলের বাংলাভাষী এলাকা নিয়ে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর জন্ম লাভ করে পুরুলিয়া জেলা। সদ্যোজাত পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভাষার অধিকার ফিরে পান মানভূমের আপামর বাংলাভাষী মানুষ।

যে উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা বাহান্নর অন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই উর্দুর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে খোদ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যে রক্ত ঝরতে পারে, তা ছিল অকল্পনীয়। রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মণ নামে দুই তরুণ কলেজ ছাত্র যারা কেবল দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, পুলিশের গুলিতে তাঁদের মৃত্যু ঘটে ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। স্কুলের ছাত্রদের একমাত্র দাবি ছিল উর্দু নয়, বাংলা ভাষার শিক্ষক চাই। বাংলা ভাষার শিক্ষক চেয়ে যে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় নামতে হবে, তা কখনো কল্পনা করা যায়নি। তাদের স্কুলে বিষয় হিসেবে উর্দু পড়ানো হয় না, তাহলে উর্দুর শিক্ষক স্কুলে কেন নিযুক্ত হবেন? তাদের প্রয়োজন বাংলা শিক্ষক। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ২০১৮ সালে স্কুলের শিক্ষার্থীরা বাংলার শিক্ষকের পরিবর্তে পাচ্ছে উর্দুর শিক্ষক। রাজ্য সরকারের এহেন কার্যাবলীই প্রমাণ করে তাঁদের উদ্দেশ্য। অবশেষে কলকাতা উচ্চ আদালত এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ একমাত্র ছাত্র সংগঠন যারা শুরু থেকে দাড়িভিটের গুলিবিদ্ধ নিহত ছাত্রদের বিচারের দাবিতে টানা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। আজও চলছে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির লড়াই। পাকিস্তানি শাসক উর্দু চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পায়নি। ভাষার প্রতি প্রেম বাঙ্গালির সত্তার অন্তর্গত। তাকে অস্বীকার করে কোনো শাসক অব্যাহতি পায়নি, পাবেও না।

(দাড়িভিটে ভাষা বলিদানী রাজেশ ও তাপস স্মরণে প্রকাশিত)

দফা এক দাবি এক মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ

বিশ্বপ্রিয় দাস

জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি, তাদের আন্দোলনকে রাজনৈতিক রং লাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে বড়ো ভুল করে ফেললেন রাজ্যের শাসক দল ও মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্য সচিব, রাজ্যের মুখ্য সচিব ও পুলিশ প্রধানকে পাশে বসিয়ে রাজ্যের আপামর জনসাধারণকে অপমান করলেন এই বলে যে, এই আন্দোলনের পিছনে রাজনৈতিক প্রভাব আছে। তিনি একজন মহিলা হয়ে রাত দখল করার জন্য রাস্তায় নামা নারীদের সুবিচার চাওয়াটা কি অন্যায় মনে করছেন? তিনি একবারও মনে করছেন না যে একটি তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুতে মানুষের ক্ষোভ আগ্নেয়গিরির চেহারা নিয়েছে। সেই অগ্ন্যুৎপাতে রাজ্যের শাসক দল ছাই হয়ে যাবে, সেটা একবারও বুঝছেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এটা হয়তো তিনি ভুলে গেছেন যে, রাজ্যে বাম জমানার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক জনবিপ্লবের মধ্যে দিয়েই তাঁর উত্থান। বর্তমানের এই জনবিপ্লব তাঁর বিরুদ্ধে জনরোষের সৃষ্টি করেছে। জুনিয়র চিকিৎসকরা যে আন্দোলনে নেমেছেন তাদের শর্তগুলি কি অতি ভয়ংকর?

ইতিমধ্যে নানা সংবাদ মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে এই শর্তগুলি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত। যে তরুণী নৃশংসতার চরমতম পর্যায়ের সাক্ষী হয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, তার মৃত্যুর মূল্যমান নির্ধারণ করে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি কতটা অমানবিক একজন নারী। তিনি প্রকাশ্যে মিথ্যাচারও করেছেন এই বিষয়ে। তাঁর উচিত ছিল যে কারণে একদল হায়না ছিঁড়ে খেল একজন চিকিৎসককে, তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা করা। যখন সংবাদমাধ্যমে জুনিয়র চিকিৎসকেরা একের পর এক তথ্য সামনে এনে দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে এটি একটি সংগঠিত হত্যা, তখন থেকেই সাধারণ মানুষ বিচার চেয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন। রাজ্যের শাসক দলের অনুপ্রেরণা প্রাপকরা তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছেন, একথাও দেশের সমস্ত সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হতেই মানুষের প্রতিবাদ রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমে তা দেশের মাটি ছাড়িয়ে বিদেশেও 'জাস্টিস ফর আরজি কর' রূপে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রাজ্যের এই দুর্নাম কি মুখ্যমন্ত্রী মুছতে পারবেন? অবশ্য তাঁর কী এসে যায়! তিনি মানুষকে উৎসবে মাততে বলছেন। এই মনোভাবে বোঝা গেছে তিনি কতটা নৃশংস।

তাঁর এক মন্ত্রী এই আন্দোলনে রাজনীতি খুঁজলেন। একবার এক ছাত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কথার বিরোধিতা করলে তিনি তাকে প্রকাশ্যে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে মঞ্চ থেকে হুংকার দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন। মনে করিয়ে দিলাম এই কারণে, গত ১১ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রতিমন্ত্রী তাঁকেই অনুসরণ করলেন। এটি মনে হয় মুখ্যমন্ত্রী রপ্ত করেছিলেন বাম জমানার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছ থেকে। জুনিয়র চিকিৎসকদের এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক তকমা দেওয়ার আগে তাঁর ভাবা উচিত ছিল যে এটি মানবিকতাকে বাঁচিয়ে রাখার একটি আন্দোলন।

মেদিনীপুর থেকে আসা এক বৃদ্ধ হাতপাখা দিয়ে ঈশ্বরের রূপ, চিকিৎসকদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে হাওয়া করছেন। লালবাজার অভিযানের সময় দেখা গেছে, এক বৃদ্ধ আন্দোলনকারীদের মুখে সাধ্য মতো খাবার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। একজন সামান্য চা বিক্রেতা সকলকে চা খাওয়াচ্ছেন। এঁরা সকলেই কোনো রাজনৈতিক দল করেন বলে দাবি করবেন মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর অনুপ্রাণিত ওই মহিলা প্রতিমন্ত্রী? আবারও মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি, এটি একটি জন আন্দোলন। যা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, রাজ্যের প্রশাসনের বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রীর সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় চলা দুর্নীতিরাজ কায়েমের বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এই আন্দোলনকে সমর্থন বা পাশে থাকার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা শামিল হয়েছেন। তিনি ও তাঁর দল এখন দিশেহারা। বিনাশকালে বুদ্ধিনাশের মতো। মুখ্যমন্ত্রী বহু সরকারি কর্মচারীকে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে, উৎকোচ দিয়ে, দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা রোজগারের সুযোগ করে দিয়ে দমিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আজও বিবেক জাগ্রত আছে কিছু মানুষের। তাঁরা সকলেই চটিচাটা নন। তাঁরা এসে সমর্থন জানিয়েছেন আন্দোলনের। মুখ্যমন্ত্রী তাদের শাস্তি দেওয়ার পথ খুঁজছেন। তিনি একবারও ভেবে দেখেছেন কি, যদি বিশাল সংখ্যক চিকিৎসক সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন। তিনি সামলাতে পারবেন তো ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে? তিনি পারেন এই সাত হাজারের একটু বেশি জুনিয়র চিকিৎসকদের শাস্তি দিতে। কিন্তু এঁদের পিছনে যারা আছেন, তাঁদের ঠেকাতে পারবেন তো তিনি? জানি তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রী। পারেন অনেক কিছুই। প্রশ্ন জাগে, সন্দীপ ঘোষেরা অনেকদিন ধরেই দুষ্কর্ম করে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে কি কোনো খবর ছিল না? তাহলে তো তিনি পরিচালক হিসাবে ব্যর্থ। তাঁর ওই পদে থাকার কোনো যোগ্যতাই নেই। তাই রাজ্যের মানুষ অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ দাবি করছে। □

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫'৫", সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য।

যোগাযোগ : ৮৭৭৭৮১৬৪০০

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩১

আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

দাম : ৭০.০০ টাকা